ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ।। ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ১৭ মে, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

মুসলিম সংরক্ষণ

সংরক্ষণের ভাঁওতা

গুরু বিশ্বাস।। বিশ্বের প্রবলতম সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে দাসখৎ লিখে দিয়ে আংশিক ভারতের স্বাধীনতার পর যাঁরা স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার কথা ভাবলেন তাঁদের মাথায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভূত এমনভাবে চেপে বসেছিল যে দেশের স্বার্থ এবং অসাম্প্রদায়িকতা দুটোকে একসঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। ফলে এখানেই তাঁরা স্থির করলেন দেশে ধর্মীয়, ভাষাগত, আঞ্চলিকতাবাদ সংক্রান্ত কোনও পার্থক্য কোনও ভাবেই করা হবে না (আর্টিকেল ১৪, ১৫)। সমন্বয়বাদী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে

গিয়ে তাঁরা দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের সমান অধিকার রক্ষা করার জন্যে সংবিধানকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করলেন। অথচ আইন প্রণয়নের বেলায় তাঁরা দেশের প্রয়োজনে দেশের সমান অধিকারভোগী সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন আইন প্রণয়ন করতে পারলেন না। কারণ তাঁরা সমানে ভূতের তাড়া অনুভব করছিলেন বলে দেশের নাগরিকদের সমভাবে চিন্তা করতে না দিয়ে একটি অপশব্দ ঢুকিয়ে রাখলেন— সংখ্যালঘু। এই সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু বিভাজন যে তাঁদের ভাববাদী মানসিকতার সমভাব ভাবনার বৈপরীত্য একথাটা তাঁদের মাথায় না আসবার কারণ তাঁরা মূলতঃ মুসলিম লীগ তথা বিশ্বের বৃহৎ সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রবর্তিত 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' মনে মনে স্বীকার করেই নিয়েছিলেন। দ্বিজাতিতত্ত্ব স্বীকার না করলে একই দেশের নাগরিক যারা সকলে সমান খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চাকরী, পেশা প্রভৃতির অধিকারী তাদের মধ্যে আবার সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু বিভেদ সৃষ্টি হয় কী ক'রে? একদিকে অভিন্ন শাসন অভিন্ন বিচার ব্যবস্থার কথা সংবিধানে বলে আবার এক এক প্রজাতির জন্যে এক এক প্রকার দেওয়ানী আইনের কথা রাখা হ'ল কেন? যাঁরা দেশের সংবিধান প্রণয়নে

(এরপর ৪ পাতায়)

ঠোকাঠুকি

জোর ঠোকাঠুকি লেগেছে কলকাতা পুরসভার বিদায়ী মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন মেয়র সুব্রত মুখার্জীর মধ্যে। তাঁরা দু'জনেই একে অন্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন স্বস্তিকা-কে। তারই সরস বিবরণ সবিস্তার ৮ ও ৯ পাতায়।

সিপিএম নয় কংগ্রেসই প্রধান শত্রু মমতার

গূঢ় পুরুষ।। রাজ্যজুড়ে পুরসভার নির্বাচনের প্রার্থীদের দলীয় প্রচার এখন তুঙ্গে। সব রাজনৈতিক দলই মনে করছে আগামী বছর বিধানসভার নির্বাচনের আগে জনমত যাচাই করে নিতে। টানা সাতবার (৩৫ বছর) বামফ্রন্ট বিধানসভায় তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রেখেছে। অষ্টমবার সেই জয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে কিনা তার প্রতিফলন ঘটবে ৩০ মে পুরভোটের আয়নায়। অন্যদিকে, রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসন্ন কিনা জনমতের নিরিখে তাও যাচাই হবে। এই কারণেই পুরভোটকে বিধানসভার আগে 'সেমিফাইনাল' বলা হচ্ছে। কথাটা মিথ্যা নয়।

রাজ্যের বিরোধী জোট কংগ্রেস ও তৃণমূল নির্বাচনী বোঝাপড়া করে লোকসভা নির্বাচনে বড় রকমের সাফল্য পেয়েছিল। সাফল্যের প্রধান এবং সম্ভবত একমাত্র কারণ 'একের বিরুদ্ধে এক' এই নীতিতে অধিকাংশ আসনে প্রার্থী দেওয়া। মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে যে কোনও নির্বাচনে জয় পরাজয় নির্ভর করে এক বা দুই শতাংশ ভোটের হের-ফের। ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট বিগত সাতটি বিধানসভার নির্বাচনে ৪৮ থেকে ৫০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতাদের ৫১ শতাংশ ভোট আজও বামদলের কাছে অধরা। রাজ্যের বাম বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের কাছেই এই তথ্য অজানা নয়। সব দলই জানে যে আসন রফা করে নির্বাচনে গেলে সাফল্য আসবেই। তবু বিরোধী দলের আসন রফা হয় না স্রেফ কিছু নেতা নেত্রীদের 'ইগো' রাজনীতির জন্য। রাজ্যের মানুষের স্বার্থে নয়, ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থরক্ষায় বিরোধী দলের জোট হয় না। এবার পুরসভার ভোটের আগে যেমন হয়েছে।

বাম বিরোধী জোট ভেঙে যাওয়ার জন্য কংগ্রেস এবং তৃণমূল নেতৃত্ব পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করছে। অথচ এই দুই দলই মুখে বলছে তাদের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সিপিএম। কিন্তু পুরভোটে তাদের নির্বাচনী প্রচার অন্য কথা বলছে। তৃণমূলের একমাত্র লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে সাইনবোর্ড পার্টি করে দেওয়া। যাতে বিধানসভার নির্বাচনের সময় কংগ্রেস আজ্ঞাবহ লেজুড় পার্টি হয়েই জোটে থাকে। সি পি এম যেমন আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লককে বামফ্রন্টে রেখেছে। কংগ্রেসও জানে পুরভোটে এবার দলের সম্মান রক্ষার লড়াই। এই লড়াই তাদের বাঁচার লড়াই। এই লড়াই তাদের জিততে হবে। তাই এবার দুই

(এরপর ৪ পাতায়)

আইনি জটিলতায় কাসভের ফাঁসি এখনই সম্ভব নয়

রঞ্জিত রায়।। মহম্মদ আজমল আমির কাসভ। মুম্বাইয়ে পাক আত্মঘাতী জঙ্গি হামলার একমাত্র জীবিত অপরাধী। বৃহস্পতিবার ৬ মে যার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণায় সারা দেশ আনন্দিত, উদ্বেলিত। মুম্বাইয়ের সবজিমন্ডির চৌরাহায় যাকে ফাঁসিতে

ঝোলাতে চেয়েছে অনেকেই। কিন্তু সত্যি সত্যি কী কাসভের দ্রুত ফাঁসি দেওয়া সম্ভব? বাস্তব অভিজ্ঞতা তা বলছে না। স্বাধীনতোর ভারতে আদালত মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর এক সপ্তাহের মধ্যে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ আপ্তেকে। আদালত মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিল ১৯৪৯-এর ৮ নভেম্বর। ফাঁসি হয় ১৯৪৯-র ১৫ নভেম্বর। এরপর এমন দ্রুততার সঙ্গে অন্য কোনও অপরাধীকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়নি। সেই প্রথম ও সেই শেষবার। এমনকী ইন্দিরা হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী কেহর সিং, সতবন্ত সিং, বলবন্ত সিংকে ফাঁসি দিতে সময় লেগেছিল তিন বছর। ১৯৮৬ সাল থেকে '৮৯ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রাণদণ্ড কার্যকর করতে।

জঙ্গি নাশকতা চালানোর জন্য জেহাদি হামলায় ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে ফাঁসি দেওয়ার সাহস দুর্ভাগ্যক্রমে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কোনও সরকারই তেমনভাবে

(এরপর ৪ পাতায়)

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগকে শেষ করতে চাইছে সি পি এম

রমাপ্রসাদ দত্ত।। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বাষট্টি বছর, তখন গড়ে ওঠে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। বয়সের হিসেবে এখন থেকে সাতাশি বছর আগে। এখনও রবীন্দ্রনাথের বইয়ের চাহিদা যথেষ্ট। রবীন্দ্র গ্রন্থস্বত্ব বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে চলে যাওয়ার পরে কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার নানান মাপের প্রকাশক রবীন্দ্ররচনাবলী বা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বই প্রকাশ করেছেন। ব্যবসা হয়েছে ভালোই। তবে যাঁরা একটু নিখুঁত প্রকাশন সংগ্রহে আগ্রহী তাঁরা ভরসা করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের উপর। বলতে চেয়েছেন এটাই, 'গ্রন্থন বিভাগের প্রকাশন মান আগের মতো না হলেও রবীন্দ্রনাথের লেখা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এখনও নির্ভরযোগ্য।' এমনকী বাংলাদেশের বেশ কিছু আগমার্কা রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুকে বলতে শুনেছি, 'আমাদের দেশের রবীন্দ্ররচনাবলীকে ভরসা করা যায় না। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের বই ছাড়া কিছু ব্যবহার করি না।'

রবীন্দ্ররচনার গ্রন্থস্বত্ব বিশ্বভারতীর আওতা থেকে চলে যাবার প্রায় দশ বছর বাদেও এই ছবিটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই উজ্জ্বল বাক্যমণ্ডিত ছবিটির পাশাপাশি খুবই করুণ চিত্র। সেটা বোঝার জন্যে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের হালফিল খবর কিছু নেওয়া যেতে পারে। একটা কথা প্রথমেই বলা ভালো, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ তার সুনাম এবং ভূমিকা যথাযথভাবে বজায় রাখতে আগ্রহী নয়। কেন নয় সেকথায় পরে আসছি। তার আগে সাতাশি বছর বয়সী গ্রন্থন বিভাগ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা দরকার।

এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস ও ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের কাছে ছিল রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি বইয়ের প্রকাশন স্বত্ব সাতাশি বছর আগে। রবীন্দ্রনাথ নিজের সব বই

বিশ্বভারতীর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ গড়ে তোলার ভাবনা তার মধ্যে ছিল। ইন্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষকে অনুরোধ করেন রবীন্দ্রনাথ বইগুলি দেওয়ার জন্য। একটা চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২ তারিখে। তাতে বলা হয়েছিল, 'আমার সমস্ত বাংলা বইগুলির স্বত্ব লেখাপড়া করিয়া বিশ্বভারতীর হাতে দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লইয়াছি।' অধিকারের হস্তান্তর সম্পর্কে কথা চলছিল। রবীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে এলাহাবাদে গিয়েছিলেন চারজন। নেপালচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। চিন্তামণি ঘোষ সব প্রত্যর্পণে রাজি হন। সব বইয়ের মূল্য ঠিক হয় ৭৮ হাজার টাকা। চিন্তামণি ঘোষ তিনভাগের এক ভাগ নিয়ে অর্থাৎ ২৬ হাজার টাকা নিয়ে সব বিশ্বভারতীকে ফিরিয়ে দেন। চিন্তামণি ঘোষ ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশে উদ্যোগী হন। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু 'প্রবাসী'-র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অনুরোধ করেছিলেন চিন্তামণি ঘোষকে—ভাবুন, একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশের জন্যে কলকাতার বইপাড়ার কোনও প্রকাশন-সংস্থা আগ্রহ দেখাননি। রবীন্দ্রনাথের বইগুলি প্রকাশ করা দরকার—এটা বুঝে রামানন্দবাবু উদ্যোগ নিয়ে চিন্তামণি ঘোষকে অনুরোধ জানালে তিনি রাজি হন। আবার বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ গড়ে তোলার পরিকল্পনার সময় পূর্ণ সহযোগিতা করেন। গ্রন্থন বিভাগ পত্তনের পর রবীন্দ্রনাথ আঠারো বছর বেঁচেছিলেন। রুচিসুন্দর প্রকাশন তিনি দেখে গিয়েছিলেন। গ্রন্থন বিভাগকে ঘিরে তাঁর ভাবনা কম ছিল না।

একদল নিষ্ঠাবান কর্মী যুক্ত হয়েছিলেন গ্রন্থন বিভাগের কাজে। সমবেত কাজে

(এরপর ৪ পাতায়)

সাংবিধানিক পথেই সঙ্ঘের আস্থা : ভাইয়াজী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দেশ জুড়ে স্থানে স্থানে বিস্ফোরণের ঘটনায় সম্প্রতি কিছু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে এখবর প্রকাশিত হয়েছে। ওই খবরে ওই ঘটনার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে যুক্ত করে বিভ্রান্তি তৈরির প্রয়াস চলছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সরকার্যবাহ সুরেশজী যোশী (ভাইয়াজী) এইরকম অপপ্রয়াসকে কঠোর নিন্দা করেছেন।

তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সদাসর্বদা সাংবিধানিক পথেই বিশ্বাস করে। বেআইনি হিংসাত্মক কার্যকলাপকে সঙ্ঘ কখনও সমর্থন করে না বা প্রশ্রয় দেয় না।

নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সঙ্ঘ তৎসম্পর্কিত সকল পদাধিকারীকেই তৎক্ষণাৎ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছে।

অভিযুক্তদের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং নিরপরাধ লোকেদের যেন হয়রানি না করা হয়।

এক বিবৃতিতে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী উপরোক্ত বক্তব্য জানিয়েছেন।

পবিত্রদা

বিজয় আঢ্য

পবিত্রদার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ন'য়ের দশকে। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে কাঠামো ধুলিসাৎ করে দেওয়ার পর দেশজুড়ে যে উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে। কী ক্ষুরধার লেখনী! মসী যে কিভাবে অসি হয়ে উঠতে পারে বাংলার মানুষ তখন তা প্রত্যক্ষ করেছিল। রামমন্দির আন্দোলনের এক নির্ভীক সেনাপতি। অথচ যে মানুষ এত তেজস্বী, আপাতদৃষ্টিতে তিনি কত নিরীহ সরল সাদাসিধে শান্ত। সদাহাস্যময় এক পুরুষ। বোধহয়, কোনও একটা ইস্যুতে একটু উত্তেজিত হওয়া ছাড়া পবিত্রদাকে রাগতে দেখিনি। এন্টালীর জোড়া গির্জার সামনে 'বর্তমান'-এর পুরনো অফিসে তো বটেই, গাঙ্গুলিবাগানের বাড়ি থেকে সেলিমপুরের ফ্ল্যাটে বেশ কয়েকবারই গেছি। সর্বদাই সেই পরিচিত হাসিমুখ। এই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে স্বস্তিকার প্রয়াত সম্পাদক ভবেন্দু ভট্টাচার্যর সংবর্ধনা উপলক্ষে। ভবেন্দুদাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন পবিত্রদা।

পরলোকে পবিত্র কুমার ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক পবিত্রকুমার ঘোষ চলে গেলেন। গত ৭ মে শুক্রবার বিকালে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই কন্যা ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠককে। স্বস্তিকা হারাল তার এক শুভাকাঙ্ক্ষী তথা লেখককে।

স্বস্তিকার পক্ষ থেকে মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করা হয়।

স্বস্তিকা-র এক স্মরণীয় মুহূর্ত। ভবেন্দুদাকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন পবিত্রদা।

ভবেন্দুদার সংবর্ধনা সভায় অতিথি হওয়ার প্রস্তাবে তিনি সানন্দে সম্মতি জানিয়েছিলেন। এসেও ছিলেন। সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন। স্বস্তিকার ইতিহাসে তা এক স্মরণীয় মুহূর্ত।

গাঙ্গুলিবাগানের বাড়ীতে একদিন গেছি। সেদিন বোধ হয় ওঁকে একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। বললেন, চলুন, গাড়ীতে বসেই কথা হবে। গাড়ীতেই কথা হলো।

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পবিত্রদা, আপনি এত লেখা এত তথ্যসহ এত তাড়াতাড়ি লেখেন কী করে?

আবার সেই হাসি। বললেন, আসলে আমি রোজই কাগজ থেকে দরকারি তথ্যগুলো 'নোট' করে রাখি। অনেক দিন ধরে করার ফলে তথ্যগুলো সহজেই পেয়ে যাই। তাই....

স্বস্তিকার জন্য কিছু লিখতে বললে তিনি কখনও না করেননি। তা সে পূজা সংখ্যাতেই হোক কিংবা কোনও বিশেষ সংখ্যায়। একবার তো তিনি নিজেই বললেন স্বস্তিকার জন্য আমি নিয়মিত লিখবো। আমার তো হাতে চাঁদ পাওয়ার অবস্থা। লিখলেনও। বেশ কয়েক সপ্তাহ। তারপর একদিন ডেকে নিজেই কিছু অসুবিধার কথা জানালেন। নিয়মিত হয়তো আর হলো না। কিন্তু অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত যখনই বলেছি, তখনই লেখা পেয়েছি। অতি কুণ্ঠার সঙ্গে একবার যখন সামান্য সম্মান দক্ষিণার নেওয়ার কথা বলেছিলাম, স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে বলেছেন—না না, এটা ঈশ্বরের কাজ। বস্তুত, স্বস্তিকার সঙ্গে পবিত্রদার সম্পর্কটা ছিল এমনই। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা 'ওয়ানওয়ে' ছিল না। তিনি বেশ কয়েকবার হঠাৎ হঠাৎই স্বস্তিকা অফিসে চলে এসেছেন।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে পবিত্রদার সঙ্গে আলোচনা হোত। বলতেন, ইসলাম কোনও ধর্ম নয়। এটা পলিটিক্যাল ইজম—রাজনৈতিক মতাদর্শ। কমিউনিজমের মতো এটাও একটা ইজম। কখনওবা রামমন্দির নিয়ে এন ডি এ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র কঠোর সমালোচনা। বলতেন, কেন এই দ্বিচারিতা? হিন্দুর ভোটে জিতে হিন্দুদেরকেই ঠকানো? আবার রাজ্য-রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হলে বলতেন—আমাদের কাগজের পলিসি একটাই—রাজ্য সরকার ও তার প্রধান শরিকের মুখোশ খুলে দেওয়া।

পবিত্রদার ব্যক্তিত্বের এটা যেমন একটা দিক, তেমনি আরও একটা দিক ছিল। ঈশ্বরে নিবেদিত প্রাণ পবিত্রদা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত। ঠাকুর-মা সারদা আর স্বামীজীকে নিয়ে তাঁর সেই জগৎ। সেই অতীন্দ্রিয়লোকের সাধক পবিত্রদার কথা তেমন জানি না। তাঁর রচনাতেই যেটুকু উদ্ভাসিত সেইটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। সেলিমপুর ফ্ল্যাটে তাঁর লেখাপড়ার খবরটা অনেকটা সাধনকক্ষের মতোই। একবার তাঁর সঙ্গে যাদবপুরে সত্যানন্দ দেবায়তনে গিয়েছিলাম। তিনি সেখানকার দীক্ষিত ছিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে পবিত্রদার কাছে একটু ঋণী। 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশ ও সমাজ ভাবনা' গবেষণা গ্রন্থটির তিনি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। বস্তুত অসুস্থতার আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তাঁর প্রয়াণে বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। ভাবতে অবাক লাগে, এমন একজন মহৎ প্রাণ মানুষের প্রয়াণের জন্য এক লাইনও খরচ করেনি সংবাদমাধ্যমের একাংশ—বাজারিই বটে।

এই সময়

পথ তুমি কার

প্রশ্নসূচক হেডলাইনের সহজ উত্তর—পথিকের। কিন্তু গোল বেঁধেছে পথিককে নিয়ে। চীনের সীমারেখা বরাবর কৌশল-গতভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে রাস্তাটি গড়ে তোলা হচ্ছিল সরকারি উদ্যোগে, আচমকাই সেই সরকারই নির্দেশ দিয়েছে এই প্রকল্পটি স্থানান্তরিত করতে হবে নকশাল অধ্যুষিত মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে। প্রকল্পটির নাম জাতীয় সড়ক-১৬, প্রকল্পটি দেখভাল করছে বর্ডার-রোডস অর্গানাইজেশন। চীন নিয়ন্ত্রণ সীমারেখা বরাবর বছরভরই রাস্তা তৈরি ও পরিকাঠামো নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত থাকে। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতেই তাদের এহেন কর্মকাণ্ড। এটাকেই কাউন্টার করতে চেয়েছিল ভারত। কিন্তু দান্তেওয়াড়া আর বিজাপুর নড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রের ফোকাসটাকেই। তবে মাওবাদী চীন কিংবা দেশী মাওবাদী—এই দুই দুষ্টশক্তির আগ্রাসন রোখাটাই ভারতের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করছেন সমর-বিশেষজ্ঞরা।

পাগড়ি-ব্যথা

এতদিন সর্দারজীদের মস্তিষ্কের ওপর সুদৃশ্য পাগড়ি দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন মহানগরীর মানুষ-জন। ধড়ের ওপর মস্তিষ্ক থাকলে, মাথা-ব্যথা যেমন আবশ্যিক; তেমনি মস্তিষ্কের ওপর পাগড়ি থাকলে, পাগড়ি-ব্যথা হওয়াটাও যে বাঞ্ছনীয় সে কথা আর কলকাতার সাধারণ পাবলিকে বুঝবে কি করে? তারা বুঝুক ছাই না বুঝুক, কলকাত্তাইয়া সর্দারজিদের মাথা-ব্যথা থুড়ি পাগড়ি-ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। সৌজন্যে খুদে সর্দারজীরা। যারা পাগড়ি বাঁধার কৌশলটাই রপ্ত করতে পারেনি এতদিনে। এতে বেজায় চটেছেন বড়ে সর্দারজীরা। তাঁরা বলছেন—'শিখসমাজের মধ্যে পাগড়ি বাঁধার যে ঐতিহ্যটা বহুদিন ধরে চলে আসছে, কলকাতায় আমাদের যুবসমাজের এখন যা ধরন-ধারণ তাতে আগামীদিনে এই ঐতিহ্যটা আর টিকবে বলে মনে হয় না। এমন হলে পাগড়ি বাঁধা শিখ আগামীদিনে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিতে পরিণত হবে কলকাতায়।'

উভয়-সংকট

খবরটা এতদিন জানা ছিলই। কিন্তু মুসলিম-প্রেমী তথা পাকিস্তান-প্রেমীরা খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলতো এতদিন। কারণটা সহজবোধ্য। এটা ভারতের খেয়ে ভারতেরই দাড়ি ওপড়ানোর চিরকালীন কমিউনিস্ট ঐতিহ্য। কিন্তু এবার তাদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে ভারতে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার এম কাদাকিন জানিয়ে দিয়েছেন আফ-পাক অঞ্চলে চল্লিশটি জঙ্গি ঘাঁটি রয়েছে। এখন সিপিএম তথা দেশবিরোধী কমিউনিস্টদের অবস্থাটা হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলার মতো। আলেকজাণ্ডারকে না পারছে গিলতে কেননা তাহলে মুসলিমরা ক্ষুব্ধ হবে (বিশেষ করে ২০১১-য় বিধানসভা নির্বাচনে এই ভোট অপরিহার্য), আবার না পারছে ওগরাতে কারণ লোকে বলবে বাবা (পড়ুন রাশিয়া) ছেলে (পড়ুন সিপিএম)-কে ত্যাজ্যপুত্র করেছে।

ফতোয়া ও হাইকোর্ট

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হুকুম জারি করেছেন, প্রত্যেক শিক্ষিকার বোরখা পরা আবশ্যক। কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর রায়ে জানিয়েছেন পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে শিক্ষিকার ওপর জবরদস্তি করতে পারবে না স্কুল কর্তৃপক্ষ। শালীনতা বজায় রেখে যে পোশাকে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্য সেই পোশাকই পরবেন। আলিয়া ও হাইকোর্ট মেলাতে পারছেন না তো? পারবেনও না। কারণ তারা চলে শরিয়তী নিয়মে আর হাইকোর্ট চলে দেশের সংবিধান মেনে। তবে শেষ বিচারে জয়ী হবে আলিয়াই; কারণ রয়েছে রাজনীতিকরা, যাদের কাছে ভোট বড় বালাই।

গডকরির সংশয়

২৬।১১ কাণ্ডের খলনায়ক আজমল কাসভকে মুম্বাই-এর নিম্ন আদালত ফাঁসির শাস্তির বিধান দেওয়ায় ভারতবাসী যতই নিশ্চিন্ত হোন না কেন, ইউ পি এ সরকারের হাল চাল মোটেই স্বস্তি দিচ্ছে না বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকড়িকে। বর্তমান সরকারের মুসলমান তোষণ যেভাবে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তাতে গডকরির মনে হচ্ছে—'কাসভের ফাঁসি আদৌ হবে কিনা বা হলে কবে হবে আমি তা নিয়ে নিশ্চিত নই। ২০০১ সালে সংসদ ভবন আক্রমণের ঘটনায় আফজল গুরুকে ফাঁসির বিধান দেওয়া হলেও তা আজও কার্যকর হয়নি। এরকম অনেক ঘটনা এখনও ঝুলে রয়েছে।'

প্রশংসিত রমেশ

অকাজ কিংবা কুকাজ করলে তার যেমন নিন্দে হবেই, তেমনি ভাল কাজ করলে সে প্রশংসাও পাবে। এহেন নীতিকথা কিংবা উপদেশ যাই বলুন না কেন তাতে এবার প্রতীতি জন্মানোর কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশের। বিটি বেগুন কাণ্ডে কিংবা সম্প্রতি চীনে গিয়ে এদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সম্পর্কিত বেফাঁস মন্তব্য করায় যেমন তাঁকে বেশ ভালরকম সমালোচনা হজম করতে হয়েছে, তেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গাউন কিংবা টুপি পরার বিলিতি কায়দা বর্জন করে স্বদেশী আদব গ্রহণের কথা বলে রীতিমতো সমাদৃতও হয়েছেন জয়রাম। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের ভূপালস্থিত আই আই এফ এমের বার্ষিক সমাবর্তনে এসে ভবিষ্যতে এরকম অনুষ্ঠানগুলিতে 'স্বদেশী গ্রহণে'র আহ্বান করায় তাঁর প্রশংসা করেছেন শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতির রাষ্ট্রীয় সহ-আহ্বায়ক অতুল কোঠারী।

সাতদিনে তিনবার

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ৪,০৫৭ কিমি দীর্ঘ লাইন অব্ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল পেরিয়ে ভারতসীমান্ত ঢুকে হামলা চালাল চীনা-হানাদাররা। চীনের পীপুল লিবারেশন আর্মির লোকেরা ট্রিগ হাইটস এবং পাংগঙ্ টি সো-তে ৩ মে থেকে ২০ মে পর্যন্ত অন্তত তিনবার হামলা চালিয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর। পূর্বলাদাখের এই অবস্থানগুলো দেশের নিরাপত্তার দিক দিয়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এহেন হামলার ঘটনায় নিরাপত্তাজনিত আরও একটি উদ্বেগপূর্ণ তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। তথ্যটা হলো, ভারত থেকে তিব্বতের ৪,২১৮ মিটার উচ্চতায় চীনা-হানাদারদের পায়ের ছাপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কাসভের কেবল মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে, মৃত্যু হয় নাই

মৃত্যুদণ্ড বিধানের সঙ্গে মৃত্যুর যেন এদেশে আকাশ-পাতাল ফারাক। বিশেষ করিয়া সেই মৃত্যুদণ্ডধারী যদি একজন মুসলমান হইয়া থাকে। কেন যে ইহা শুরু হইতেই চলিয়া আসিতেছে কে জানে? জনগণের মনে কিন্তু এই ধারণা একেবারে বদ্ধ মূল হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু মেয়েকে কোনও মুসলমান অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেও হিন্দু পিতার সাহায্যে আসিতেও পুলিশ আইন আদালত কেমন সিটকাইয়া থাকে। প্রিয়াংকা টোডির পিতাকে সাহায্য করিতে পুলিশকে কি হেনস্থাটাই না হইতে হইয়াছে! কৌশলে অপহরণ করিয়া রিজওয়ানুর রহমানের পরিবার তো রাজনীতির জগতে এখন হিরো বনিয়া গিয়াছে। বিপরীত দিকে মুর্শিদাবাদ, মালদা, বসিরহাট এবং জম্মুর হিন্দু ছেলে মুসলমান মেয়েকে বিবাহ করিয়া নৃশংসভাবে প্রাণ দিয়াছে। তাহাদের পরিবারের জন্য না পুলিশ-প্রশাসন, না আইন-আদালত, না গণ-মাধ্যম, না কোনও রাজনৈতিক দল—কেহই আগাইয়া আসে নাই।

এইরকম নানান তিক্ত অভিজ্ঞতাই অসহায় হিন্দু জনগণের মনে কংগ্রেস সরকার-চালিত আইন-আদালত প্রশাসন সম্পর্কে এক ধরনের অবিশ্বাস বদ্ধ মূল হইয়াছে। এটাতো মিথ্যা নয় যে ধনঞ্জয়কে ফাঁসি দেওয়াতে প্রশাসন যে ব্যগ্রতা, কঠোরতা ও আইনি-নিষ্ঠা দেখাইয়াছিল, আফজল গুরুর ফাঁসী কার্যকর করিতে তেমনি আগ্রহ কেন দেখাইতেছে না। প্রথম জনের অপরাধ ছিল এক ব্যক্তির প্রতি। দ্বিতীয় জনের অপরাধ কিন্তু ছিল ভারত রাষ্ট্রের পীঠস্থান ভারতীয় সংসদের বিরুদ্ধে। সে ভারতীয় গণতন্ত্রকে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রকে আঘাত করিয়াছিল। ইহা রাষ্ট্রীয় অপরাধ। ইহা ক্ষমার অযোগ্য।

রাষ্ট্রপতির (কংগ্রেসের ভোটে নির্বাচিত) নিকট আফজল গুরুর মৃত্যুদণ্ড এখনও গুরুত্ব পায় নাই। বছরের পর বছর ধরিয়া মৃত্যুদণ্ড অকার্যকর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ধনঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ড তড়িঘড়ি দেওয়া অপরিহার্য মনে হইয়াছিল, কারণ সে ছিল হিন্দু। হিন্দুস্থানে হিন্দু নিধন হইবে ইহা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। সেই কারণে মুসলিমদের নিধন বিরল ঘটনা। তাহা লইয়া গণমাধ্যমগুলি তো বটেই, ধর্মনিরপেক্ষ তকমাধারী রাজনৈতিক দলগুলি পর্যন্ত হায় হায় করিয়া করিয়া উঠে।

কাসভের মৃত্যুদণ্ড লইয়াও স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম দুনিয়ার আশীর্বাদধন্য পত্র-পত্রিকায় কিছু মানুষ পুনরায় মানবিকতার হাওয়া তুলিয়াছে। যেন মানবিকতা কেবল হত্যাকারীর প্রাপ্য। নিহতের জন্য নয়। হত্যাকারীরা নিরন্তর হত্যালীলা চালাইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া চলিবে না। বছরে একজন সন্ত্রাসবাদী বা হত্যাকারীর পিছনে জনগণের করের অর্থে আনুমানিক ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হয় তাহাদিগকে কারান্তরালে বহাল তবিয়তে চবিবশ ঘণ্টা পাহারা ও আদর-আপ্যায়ন করিবার জন্য। সন্ত্রাসবাদীদের মানবিকতা প্রদর্শনে জনগণের অর্থের এমন অপচয়ই বা কেন চলিবে? এইসব ব্যক্তিগণ মানবিকতার মুখোশধারী সন্ত্রাসবাদীদের গোপন সমর্থক ছাড়া আর কিছু নয়।

মৌলবাদী মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি জনগণের ঘৃণা এমনই পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে যে তাহারা কংগ্রেস জমানায় কোনও মুসলিম সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হইতে পারে না এমন কথা দৃঢ়তার সহিত রাস্তাঘাটে বলিতেও দ্বিধা করিতেছেনা। কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি এই অবিশ্বাসের কি কোনও হেতু নাই? নিশ্চয়ই আছে। এ পর্যন্ত ঊনত্রিশটির মতো ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে নাকি পড়িয়া আছে। নড়েও না, চড়েও না, কংগ্রেস সরকারের অন্তরাত্মার ইশারা ছাড়া তো কিছুই হয় না। এই সকল মুসলিম খুনীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ইচ্ছা হয়ত বা ওই অন্তরাত্মার নাই। তাই তাহার ইশারায় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির ঘাড়ে কি ক্ষমতা আছে এই সকল মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে?

জনগণের অবিশ্বাসের ইহাই হেতু। তাহারা জানে কাসভের কেবল মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে, মৃত্যু এখনও হয় নাই। বছরে ৩০ কোটি হিসাবে ইতিমধ্যেই কত শত কোটি ব্যয় হইয়া গিয়াছে সরকারের, তাহা সরকারই জানে। জনগণ শুধু জানে, এখনও অনেক বছর এই পাকিস্তানীদের জামাই আদর করিয়া যাইতে হইবে ইহাই কংগ্রেসী-ভারতের ভবিতব্য।

কাসভ ও তাহার সঙ্গী পাক-জঙ্গিরা যে তাণ্ডব ও হত্যালীলা চালাইয়া প্রায় দুইশত নিরপরাধ ভারতবাসী ও বিদেশী নাগরিকদের খতম করিয়াছে তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও বিদেহী আত্মার প্রতি রাষ্ট্রের যেন কোনও কর্তব্যই নাই। তিনদিনের যুদ্ধে রাষ্ট্ররক্ষা করিতে যে নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসারবর্গ প্রাণ বিসর্জন দিলেন তাহাদের প্রতি কর্তব্য কি কাসভকে জিয়াইয়া রাখিয়াই সমাপ্ত হইবে?

জাতীয়জাগরণেরমন্ত্র

চাই কি? পরিষ্কার শরীরে পরিষ্কার কাপড় পরা, মুখ ধোয়া দাঁত মাজা—সব চাই, কিন্তু গোপনে। ঘর পরিষ্কার চাই। রাস্তাঘাটও পরিষ্কার চাই। পরিষ্কার রাঁধুনী, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই। আবার পরিষ্কার মনোরম স্থানে পরিষ্কার পাত্রে খাওয়া চাই—'আচারঃ প্রথমো ধর্মঃ।' আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া। আচার ভ্রষ্টের কখন ধর্ম হবে? অনাচারীর দুঃখ দেখছ না, দেখেও শিখছ না? এত ওলাউঠা, এত মহামারী, ম্যালেরিয়া—কার দোষ? আমাদের দোষ। আমরা মহা অনাচারী!

—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, স্বামী বিবেকানন্দ

আই পি এলে ধামাচাপা 'দান্তেওয়াড়া'

তারক সাহা

আই পি এল-এ ফেঁসে স্বেচ্ছায় শশী থারুরের পদত্যাগকে স্বাগত জানিয়েছেন চিদাম্বরম। ঘটনাটা ছোট হলেও এর গুরুত্ব অসীম। কারণ কোচি দলের আই পি এলের শেয়ার বিনামূল্যে থারুরের বান্ধবীকে পাইয়ে দেবার অভিযোগে তার বিদায়কে চিদাম্বরমের স্বাগত জানাবার অর্থ একটাই —দান্তেওয়াড়ার ঘটনার দায় থেকে চিদাম্বরমের মুক্তি।

আমাদের দেশে ইস্যুর অভাব নেই। দান্তেওয়াড়ার পর আই পি এল, তারপর ফোনে আড়িপাতার ঘটনা, এরপর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে সরকারকে বিড়ম্বনায় ফেলার হাতিয়ার—বিরোধীদের হাতে অস্ত্র কম নেই। কিন্তু চিদাম্বরমের বিড়ম্বনা কেটে গেল। গত ৬ এপ্রিলে দান্তেওয়াড়ায় মাওবাদীদের নৃশংস নারকীয় হত্যাকাণ্ড এযাবৎ সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ঘটনার প্রেক্ষিতে লোক দেখানো গোছের পদত্যাগ করার বাসনা প্রকাশ করলে প্রধানমন্ত্রী তা পত্রপাঠ নাকচ করে দেন।

এইভাবে চিদাম্বরম সকলের সহানুভূতি কুড়োলেন বটে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলে বরং নৈতিকতার দিক থেকে সবচেয়ে সঠিক কাজ হতো। কারণ নিরাপত্তাবাহিনীর ৮০ জন কর্মী যেভাবে বেঘোরে প্রাণ দিল তা কার্যত মনমোহন সরকারের সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক ব্যর্থতা। প্রসঙ্গত চিদাম্বরমের বিরুদ্ধে নানা মহল থেকে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। ইউ পি এ সরকারের প্রথম পর্বের ঠিক প্রাক্কালে চিদাম্বরমের হাতে অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব ন্যস্ত হবার ঠিক আগে চিদাম্বরম লণ্ডনে রেজিষ্ট্রিকৃত "বেদান্ত রিসোর্স পি এল সি" নামের এক কোম্পানীর অধিকর্তা ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, ছত্তিশগড় অঞ্চলের জনজাতি অধ্যুষিত এক বিরাট অঞ্চল বেআইনিভাবে ওই মাইনিং কোম্পানীর হাতে অর্পণ করার চক্রান্তের সঙ্গে চিদাম্বরম জড়িত।

২০০৪ সালে কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্টে কোম্পানীর চেয়ারম্যান চিদাম্বরমের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছিলেন ঃ "২২ মে ২০০৪ সালে চিদাম্বরম কোম্পানীর অধিকর্তার পদ থেকে পদত্যাগ করলেন ভারতের অর্থমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার পর। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি দেশের উন্নয়নে তাঁর অংশীদারিত্বের জন্য"। জনজাতি অঞ্চলকে অন্যান্যদের সঙ্গে বেদান্ত গ্রুপের হাতে তুলে দেবার প্রয়াসের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে চিদাম্বরমের নামে। তিনি এমন এক ব্যক্তি যাঁর সঙ্গে ওই কোম্পানীর সোজাসাপ্টা যোগাযোগ রয়েছে এবং যিনি জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলকে 'কর্পোরেট করিডর' বানাতে তৎপর। তিনি কার্যত দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

জর্জ বুশের ছায়াসঙ্গী হার্ভার্ড ফেরত চিদাম্বরম তাই জনজাতিদের এই উত্থাকে মিলিটারি বুটের তলায় নিষ্পেষণ করতে চান। তিনি চান দেশের ব্যাপক বনাঞ্চল জনজাতিদের মুক্ত করে উন্নয়নের নামে ওইসব খনি কোম্পানীগুলির হাতে তুলে দিতে। মাওবাদীরা কোনও অঞ্চল দখল করেনি, তারা কেবল জনজাতিদের ক্ষোভ, হতাশাকে কাজে লাগিয়েছে। এদের সহযোগিতায় দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি কেউই এগিয়ে আসেনি। একমাত্র তাদের বন্ধু বলে জনজাতিরা চিহ্নিত করেছে মাওবাদীদের। এরাই আপাতত তাদের পরিত্রাতা।

গত ৬।৪-এর দান্তেওয়াড়ায় যে ঘটনা ঘটল তার ব্যর্থতার দায় চাপে দেশের গোয়েন্দা দপ্তরের ওপর। গোয়েন্দারা পুরোপুরি ব্যর্থ মাওবাদীদের গতিবিধি সঠিকভাবে প্রশাসনের হাতে পৌঁছে দিতে। বন্দুকের গুলি দিয়ে সবকিছু এমন এক মাওবাদী সমর্থিত গণঅভ্যুত্থানকে ঠাণ্ডা করে দিতে চিদাম্বরম চাইলেও দেশের সেনাপ্রধানদের তাতে তীব্র অনীহা। বিমান বাহিনীর প্রধানের মতে, দেশের করদাতাদের অর্থে কেনা অস্ত্র দেশেরই মানুষদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা ঠিক হবে না।

এইসব হাতিয়ার কেনা হয়েছে কেবল সীমানা পারের দেশের, জাতির শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে। একই মত পোষণ

> **মাওবাদীরা কোনও অঞ্চল দখল করেনি, তারা কেবল জনজাতিদের ক্ষোভ, হতাশাকে কাজে লাগিয়েছে। এদের সহযোগিতায় দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি কেউই এগিয়ে আসেনি। একমাত্র তাদের বন্ধু বলে জনজাতিরা চিহ্নিত করেছে মাওবাদীদের।**

করেন স্থলবাহিনীর প্রধানও।

২ এপ্রিল লালগড় ঘুরে সদর্পে মাওবাদীদের জংলি ভীরু বলে ঘোষণা করার পরেই মাওবাদীরা প্রমাণ করল যে তারা ভীরু তো নয়ই বরং প্রশিক্ষিত এক বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সাফ করে দিতে তৎপর। মাইনে করা পুলিশবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে তাদের বিনা মাইনের স্বেচ্ছাসেবকরা লড়ছে কেবল তাদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে।

দেশের প্রায় দশ কোটি মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল যা দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত এবং যা অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গের মতো প্রায় চার শতাধিক গ্রাম নিয়ে পরিব্যাপ্ত, সেই অঞ্চলের মানুষ দেশের মধ্যে দ্ররিদ্রতম। এদের কাছে সভ্যতার আলোই যখন পৌঁছয়নি তখন সেখানে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল বা ১৪ বছরের নীচে শিশুদের শিক্ষা নিয়ে রাজনৈতিক কচকচানি মানায় না। উন্নয়নের নামে এসব অঞ্চলে যে কয়েকটা বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে সেখানে এখন বাচ্চাদের পড়াশুনার বদলে অপারেশন গ্রীণ হান্টের জওয়ানরা তাঁবু গেড়েছে। আর এইজন্যই মাওবাদীদের টার্গেট ওইসব বিদ্যালয়গুলি।

সমস্যার মূলে রয়েছে জনজাতিদের উৎখাত এবং তাদের বাসস্থানের নীচে লুকিয়ে থাকা দেশের ২৫ শতাংশ খনিজ সম্পদ। চিদাম্বরম এই সম্পদ ১০০টি সম্পদশালী পরিবারের মধ্যে বিলিয়ে দিতে তৎপর। চিদাম্বরমের উচিত ছিল তাঁর আইনি দক্ষতা ও ক্ষমতা ওইসব হতদরিদ্র পরিবারগুলির রক্ষার্থে ব্যবহার করা। কিন্তু, উল্টে তিনি তাঁর এই দক্ষতা কাজে লাগাচ্ছেন ১০০টি পরিবারের স্বার্থে, কারণ এরাই তাঁকে যশ, সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করছে। নববইয়ের দশকে এই চিদাম্বরমই অধুনা প্রায় বিলুপ্ত মার্কিন সংস্থা এনরনের পক্ষে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন যখন এনরন জনজাতি অঞ্চলে ব্যবসার প্রসার ঘটাতে চেয়েছে। ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা ১৩ লক্ষ টন অ্যালুমিনিয়াম, যার মধ্যে বেদান্ত গোষ্ঠীর উৎপাদন ক্ষমতাই হবে প্রায় ৯ লক্ষ টন এবং এদের কারখানা গড়ে উঠতে চলেছে ওড়িশার ঝাড়সগুডায় যা আদিবাসী অধ্যুষিত। উল্লেখ্য, এই সংস্থারই প্রাক্তন অধিকর্তা চিদাম্বরম।

ওড়িশার বক্সাইট ও কয়লার ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে বেদান্ত ২০১৩ সালের মধ্যে ঝাড়সগুডা কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ১৬ লক্ষ টনে নিয়ে যেতে চাইছে। এই উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করতে বেদান্ত কোম্পানী ৩৭৫০ মেগাওয়াটের একটা বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়বে ওড়িশার জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল লানজিগড়ে। এসব প্রক্রিয়া শেষ হতে সময় লাগবে ২০১৩ সাল। এবং এজন্যই ২০১৩ সালের মধ্যে মাওবাদীদের উৎখাত করতে চিদাম্বরম বদ্ধ পরিকর।

চিদাম্বরমের অ্যাজেণ্ডা প্রণিধানযোগ্য। ২০০৬-এ অর্থমন্ত্রী হিসেবে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে যে ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেছেন যে, স্বাধীনতার তিন দশক পর্যন্ত ভারতের অর্থনীতি ছিল সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং নেহেরু জমানায় অর্থ-নীতির জানালা ছিল রুদ্ধ, এর পরিণতি খুব খারাপ। ২০০৭ সালে মার্কিন মুলুকে এক ভাষণে উনি বলেছেন যে, ভারত খনিজ ও মানব সম্পদে সমৃদ্ধ, সুতরাং এই দুই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং এজন্য দেশজ বক্সাইট, কয়লা, টাইটেনিয়াম, হীরা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজতেলজাত পদার্থের উৎপাদন বাড়াতে হবে। আর এইসব খনিজ পদার্থগুলি রয়েছে জনজাতি তথা মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায়।

স্টারলাইট, বেদান্ত গ্রুপের কোম্পানিগুলি কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক, আমদানি শুল্ক ২০০৩ সালে দেয়নি এবং এর পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকা। চিদাম্বরমকে উকিল হিসেবে দাঁড় করিয়ে স্টারলাইট মুম্বাই উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করে স্থগিতাদেশ পেয়েছে। ২০০৪ সালে অর্থমন্ত্রী হওয়ার পরে ওই বড় পরিমাণ টাকা উদ্ধারে কার্যত ব্যর্থ অর্থমন্ত্রক।

চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের পেনসন বোর্ড বেদান্ত রিসোর্স কোম্পানীতে ৩.৮ মিলিয়ন পাউণ্ড পুঁজিনিবেশ করেছিল এই ভেবে যে কোম্পানীটি একটি নামজাদা। এথিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশক্রমে পেনশন বোর্ড গত বছর তাদের পুঁজি তুলে নেয় এইজন্য যে, বেদান্ত কোম্পানীটি ভারতের জনজাতিদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। অথচ কোম্পানীটি বড় গলা করে তাদের কর্পোরেট দায়িত্বের কথা, সামাজিক দায়িত্বের কথা চাউর করছে। ভারতে বেদান্ত কোম্পানীকে দুনিয়ার সর্ববৃহৎ ধাতু উৎপাদক বানাতে চিদাম্বরমের সহায়তায় ২০১৩ সালের মধ্যে অনেক জওয়ানের রক্ত ঝরতে দেখবে দেশবাসী।

আইনি জটিলতায় কাসভের ফাঁসি

(১ পাতার পর)

দেখাতে পারেনি। ষাটের দশকের মাঝামাঝি কাশ্মীরে শুরু হওয়া জেহাদি হামলার নাটের গুরু ছিল মকবুল ভাট। ধরা পড়ার পর মকবুলকে আদালত প্রাণদণ্ড দেয় ১৯৬৬ সালে। কিন্তু ফাঁসি হওয়ার আগেই সে জেল ভেঙে পালায়। ধরা পড়ার পরে তার ফাঁসি নিয়ে টালবাহানা চললেও জনমতের চাপে ১৯৮৪ সালে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। অর্থাৎ, আদালতের দেওয়া ফাঁসির আদেশ কার্যকর করতে সময় লেগেছিল ১৮ বছর।

কাসভের ফাঁসির আদেশ দ্রুত কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় সরকার চাইবে না। পাকিস্তানের উপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াইতে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করতে মৃত কাসভ নয়, জীবিত কাসভকে ভারতের প্রয়োজন। সম্ভবত এই যুক্তিতেই আজও ইয়াকুব মেনন এবং মহম্মদ আফজল গুরুকে ফাঁসি দেওয়া হয়নি। অয্যোধায় বাবরি ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতে দাউদ ইব্রাহিমের নির্দেশে ১৯৯৩ সালে মুম্বাইয়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ইয়াকুব ছিল অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী। দীর্ঘ বিচারের পর ২০০৭ সালের জুলাই মাসে মুম্বাইয়ের আদালত তাকে প্রাণদণ্ড দেয়। আজও সেই আদেশ কার্যকর করা হয়নি। সংসদ ভবনে হামলার ঘটনায় ২০০২ সালের ১৮ ডিসেম্বর আফজল গুরুর প্রাণদণ্ডের আদেশ হলেও তা এখনও কার্যকর করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি একটাই। এদের সকলেরই প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য আছে। এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির কাছে ২৯ জনের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন ফাইল বন্দি হয়ে রয়েছে। এদের অধিকাংশই সন্ত্রাসবাদী। ভারতীয় আইনে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো ''মার্সি পিটিশন'' বিবেচনার কোনও সময়সীমা নেই। যেমন, মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপিল মামলার বিচারের জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। তাই কাসভের মৃত্যুদণ্ড শেষ পর্যন্ত বহাল থাকবে কি না অথবা বহাল থাকলেও কার্যকর করা হবে কি না তা জানতে হয়তো আরও আট-দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ

(১ পাতার পর)

প্রকাশন মান উন্নত হয়—এটা তাঁরা বুঝেছিলেন। যে মানুষটি বিশ্বভারতীর জন্যে অত ভাবছেন, সর্বস্ব সমর্পণ করেছেন, 'তার বই সযত্নে প্রকাশের কাজকে মহান্ দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন গ্রন্থন বিভাগের কর্মীরা। এই মনোভাব বহু বছর ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসানের কুড়ি বছর বাদে জন্মশতবর্ষের সময় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কত যত্নে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশ করেছিলেন—তা এখনও অনেকের সংগ্রহকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

১৯২৩ থেকে ১৯৪১—এই আঠারো বছরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের জন্য যথেষ্ট ভেবেছেন। দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা গুণমান একটা মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের সময় গ্রন্থন বিভাগের অনেক রকম কাজ হয়েছে। তবে ১৯৬১ সালের গ্রন্থনবিভাগ আর ২০০১ সালের গ্রন্থনবিভাগকে একসঙ্গে মেলানো যাবে না। চাকরি হয়েছে অনেকের। কাজ না করলে বা সামান্য করলেই যখন বেতন মেলে তখন বেশি ভাবনার দরকার কী? সমবেত উদ্যোগে তাদের সহযোগিতা কোনও সময়েই মেলেনি। আটের দশক থেকে একদল কর্মী গ্রন্থনবিভাগের নানাভাবে ক্ষতিসাধন করেছেন হরেকরকম কৌশলে। এর পিছনে সিপিএম দলের সরাসরি মদত ছিল। গ্রন্থস্বত্ব চলে যাওয়ার সময় বিশ্বভারতী ঠিক করেছিল, এমনভাবে রবীন্দ্ররচনা প্রকাশ করা হবে, যা পাঠকদের সমাদর পাবে। তারপর আইন সংশোধন করে গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদ দশবছর বাড়ল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দেহাবসানের পর লেখকের ষাট বছর স্বত্ব তাঁর বজায় থাকল। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ও রবীন্দ্ররচনার কথা ভেবে এই আইন করা হলেও কাজটা ভালো হলো না। গ্রন্থনবিভাগের কর্মীরা অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে যেভাবে উদ্যোগ নিচ্ছিলেন, সেটারও দরকার হলো না। তারা পরম নিশ্চিন্তে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতো আচরণ শুরু করলেন। 'আসব যাব মাইনে পাব, কাজ করবো না।' যে দলটি রাজ্য সরকারি ক্ষমতায় থেকে ছড়ি ঘোরাচ্ছে সেই দলটির লোকজন একসময় রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্রাবল্যে যা খুশি করেছে। তখন তারা গ্রন্থনবিভাগে লোক ঢোকাতে পারেনি। পরে তারা গ্রন্থনবিভাগকে অচল বা অকর্মণ্য করার লোকজন ঢুকিয়ে দিল বিভিন্ন কৌশলে। গ্রন্থনবিভাগের দুঃসময় শুরু হলো সেসময় থেকে। প্রকাশন বিভাগ পেল সবক্ষেত্রে অবহেলা, ঢিলেমি, সেইসঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত হলো। সবই চলতে থাকল সিপিএম দলের শ্রমিক সংগঠনের ছত্রছায়ায়। একটি প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের মতলব চরিতার্থ করার জন্যে ঝাঁঝরা করে দিতে একটুও দ্বিধা কিংবা সংশয় থাকেনি সিপিএম দলের শ্রমিক সংগঠনের। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের আজ মান-মর্যাদা সবদিক থেকে দ্রুত নামছে, এর মূলে রয়েছে একটি রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ মদত। তারা আবার হাল আমলে রবীন্দ্রভক্তির আতিশয্য দেখায়! রবীন্দ্রনাথকে নস্যাৎ করার জন্যে সিপিএম বহু ধ্বংসাত্মক কাজের অন্যতম। বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের কয়েকজন কর্মী বললেন, গ্রন্থন বিভাগ শেষ হয়ে গেল সিপিএমের মদতে। রবীন্দ্রনাথের দেড়শোতম জন্মবর্ষে কলকাতায় বসে এই ছবি আমরা দেখবো কি নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা নিয়ে?

সংরক্ষণের ভাঁওতা

(১ পাতার পর)

অংশগ্রহণ করলেন তাঁদের একাংশ শাসনকার্যে প্রযুক্ত হয়ে সংবিধানিক বিভেদ শূন্যতা ভুলে দেশের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর বিভেদ পন্থাকে লালিত করতে লাগলেন।

সেই বিভেদপন্থার বিষবৃক্ষ দিনে দিনে বড় হতে থাকল। অক্ষম শাসকদের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্যে সেই বিভাজন নীতিকে ব্যবহার করা হ'তে লাগল। সেই সঙ্গে সমস্যা বেড়ে চলল। সংখ্যালঘু শব্দটাকে মূলধন করে একটিমাত্র শ্রেণীর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেদের কথাটাতেই গুরুত্ব আরোপ করা হলে। প্রকৃতপক্ষে যারা সামান্য সংখ্যক অথচ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত সুজন, তাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়ে রইল। এছাড়া সুবিধাবাদী কিছু রাজনীতিক ব্যবসায়ী সংখ্যালঘু শব্দটাকে ধরে নিয়ে প্রান্তীয় সংখ্যালঘু, ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রকৃতি নানারকম সংখ্যালঘু স্বার্থের জিগির তুলে দেশময় বিভেদ পন্থার প্রসার ঘটাল, অশান্তি সৃষ্টি করে চলল। তারা কৌশল হিসেবে ধরে নিল সংখ্যালঘু তক্‌মা লাগিয়ে যদি ঝামেলা বাধিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে বহিঃশত্রু সহ বহু শক্তির সাহায্য পাওয়া অতি সহজ। কারণ ভারতরাষ্ট্র সবল যাতে হ'তে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে অনেক বিদেশী রাষ্ট্রও চরচক্র সাজিয়ে চলে। তারা চেষ্টা করে অভ্যন্তরীণ অশান্তিতে ভারত বিব্রত থাকলে তার অবস্থা ক্রমশই দুর্বল হ'তে থাকবে। আর যে শক্তি অন্তর্ঘাত করছে তাকে সাহায্য করলে, শক্তি যোগালে তাদেরকেও তাঁবে রাখা যাবে।

এ ব্যাপারে পাকিস্তানী চরচক্র সর্বদাই তৎপর নানারকম উস্কানীমূলক কাজে, ভারতের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে সাহায্য করতে এবং বিদেশী সন্ত্রাসবাদীদের মাধ্যমে নানাপ্রকার ছায়াযুদ্ধে ভারতের রাষ্ট্রসীমাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখতে। ভারত স্বাধীন হবার পর কোনও সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত হয়েছে। যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি ভারতবর্ষকে ভাগ করেছে সেই প্রচেষ্টাকেই অভিন্ন ভারতীয় বোধের পরিবর্তে সংখ্যালঘু বলে শ্রেণীবিভাজন ক'রে পরোক্ষে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। জাতীয় জীবনের সম্ভাব্য সকল রকম সুবিধা সুযোগ সর্বত্র সমানভাবে প্রসারিত করা সত্ত্বেও এই সংখ্যালঘু তত্ত্বের জন্যে কাশ্মীর একটা চিরস্থায়ী অশান্তি কেন্দ্র হয়ে আছে। সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু বিভাজন জাতিকে দুর্বল করবার অপচিন্তা মাত্র।

তার ওপর নতুন বিপত্তির জন্ম হয়েছে সংরক্ষণ। সংরক্ষণ কল্পনাও সেই জাতিবাদী বিচ্ছিন্নতাপন্থী ভাবনার আর একটি সুবিধাবাদী ধারা। আপাতদৃষ্টিতে শ্রুতিমধুর এই সংরক্ষণ চিন্তার বিশ্লেষণ একান্তই প্রয়োজন। রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্ররক্ষার জন্য উন্নয়ন সমগ্র দেশ ও জাতির জন্যেই প্রয়োজন। সে জাতি ভারতীয় জনগোষ্ঠী। সকলের জন্য শিক্ষার পথ প্রশস্ত ক'রে রাখলে যে যার যোগ্যতা অনুসারে সেই শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে আমার শিক্ষার প্রয়োজন নেই তবে তার উন্নতি কেমন করে হবে? তা বলে যে শিক্ষালাভ করেনি বা করতে অপারগ তাকে উচ্চপদে অথবা সরকারি পদে বসিয়ে দিলেই কি তার উন্নয়ণ হবে! বরং যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করে তাকে কর্মহীন করে রাখলে সমাজের ক্ষতি এবং বরিষ্ঠের চিত্তবিক্ষোভের কারণ হবে। বরিষ্ঠের চিত্ত- বিক্ষোভ কোনও দেশেই গণতন্ত্রের সার্থকতা নয়।

সমাজ ভাবনা সর্বদাই সময়োপযোগী এবং তৎকালীন। কয়েক হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের মানসলোকে কর্মভিত্তিক যে শ্রেণীবিভাগ সূচিত করেছিল আজকের পরিবর্তিত বিশ্বেও কর্মভিত্তিক শ্রেণী তারও চেয়ে সূক্ষ্ম। এখনও কাজ অনুসারে বেতন সেই কর্মফলবাদকেই সূচিত করে, ভাষা কেবল ভিন্ন। এখনও কর্ম অনুসারেই পদ ও পদ অনুসারেই মর্যাদা সমাজে চলছে। এখন যাঁদের শিক্ষিত বা পণ্ডিত বলা হয় তখন তাদের বলা হোত ব্রাহ্মণ, পার্থক্য কেবল ভাষার। কোনও ব্রাহ্মণের পুত্র যে ব্রাহ্মণই হবে এমন কোনও কথা ছিল না। বরং জীবন শাস্ত্রের নির্দেশ ছিল কোনও ব্রাহ্মণ যদি নিজ কর্ম অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যাপনা না করে অন্য কর্ম করে তা হলে সে এবং তার পরিবার শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হবে। বর্তমান সমাজেও সে ব্যবস্থা সমানই আছে। কৃষকের পুত্র আই. পি. এস হয়ে বা যোগ্য শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে অধ্যাপনা করতেই পারে। এটা হচ্ছেও। সংরক্ষণ এই মেধাশক্তি ও কর্মোদ্যমের পরিপন্থী। শুধু সংরক্ষণ ব্যবস্থার সাহায্যে যদি অযোগ্য লোক কাজ পায় আর যোগ্যতর হতোদ্যম হয় তাহ'লে হয় যোগ্য এবং ক্ষমতা সম্পন্নরা দেশত্যাগী হবে, যোগ্যতার পরিচয় দেবার সুযোগ খুঁজতে বিদেশে চলে যাবে আর অযোগ্য ব্যক্তিরা দেশের প্রয়োজনীয় পদগুলো ভরে বসে থাকবে। অপকৃষ্ট মানুষের হাতে ক্ষমতা ও অধিকার ন্যস্ত হলে দেশের বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য। ইতিমধ্যেই আমাদের দেশের মেধাবী এবং উচ্চশিক্ষিত অসংখ্য ছাত্র বিদেশে গিয়ে অন্যান্য দেশের জ্ঞানভাণ্ডার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ঋদ্ধ করছে।

সংরক্ষণ এই প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। এই বিকার কি ভয়ানক জায়গায় যে ভারতরাষ্ট্রকে নিয়ে যাচ্ছে সেকথা কারও মগজে আসছে না বলেই আবার ধর্মভিত্তিক তুষ্টিকরণের চরম পথে চলতে চাইছে বর্তমানের অদূরদর্শী রাজনীতি। সংবিধান যখনই দেশের রক্ষাকবচ হিসেবে কোনওরকম ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছে তখনই আবার সেই সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে চলা রাজনৈতিক দল ও তার নেতৃবৃন্দ অমান্য করছে সংবিধানের নির্দেশকে।

দেশে দরিদ্র মানুষ ও ছাত্রদের জন্যে বিশেষ সহযোগিতার ব্যবস্থা আছে। বিভেদ শূন্য মানসিকতায় মেধাবী ছাত্রদের জন্যে সেই ব্যবস্থা আরও প্রসারিত করলে এবং সেই ধীমান মানুষ নির্মাণের ফলে দেশ উন্নত হলে যে বিকাশ হবে তা প্রাকৃতিক বর্ষণের মতো কাজ করবে, এতে দেশের সকল মানুষের কাছেই সুফল পৌঁছাবে। শিক্ষা বোধকে পরিমার্জিত করে, বোধ চেতনাকে। কাজেই বিভেদ পন্থা বাদ দিয়ে দেশকে দেশের মতো করেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যেসব কমিশন মানুষকে বিভ্রান্ত করে সেইরকম ব্যবস্থাও পরিহার করাই সৎপন্থা। সব মানুষকে সমানভাবে ভালবাসতে পারলে বিভেদ পন্থার মিথ্যাচার অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে যে কোনও সংরক্ষণ মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। সংখ্যালঘু সংরক্ষণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর। গণতন্ত্রে যদি আস্থা রাখতে হয় তাহলে সকল মানুষের প্রতি শাসকদের সমান আচরণ করতে হবে। যে শাসক সাম্প্রদায়িক শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করে মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের পিঠ নিজে চাপড়ায়। সে অবশ্যই দেশের সঙ্গে শত্রুতা করে তা মূর্খতা বশে হোক বা অপবুদ্ধি প্ররোচিত কৌশলে হিসেবেই করে থাক। দেশ যদি জনসংখ্যা ভারে সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ে তা হ'লে সংরক্ষণ সেই সর্বনাশ থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারে না। কাজেই দেশের সমস্যা সমাধান করতে হবে দৃঢ়তা সহকারে, সংরক্ষণের ভাঁওতা দিয়ে নয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবত কথা ও জ্ঞানযজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ২৫ এপ্রিল থেকে ১ মে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় শ্রীমদ্ ভাগবত কথা জ্ঞানযজ্ঞ এবং ১০৮ ভাগবত পরায়ণ অনুষ্ঠিত হয়। কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা এবং হাওড়া মহানগর মহিলা সমিতির উদ্যোগে বড়বাজারস্থিত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মন্দিরে এই ভাগবত কথা প্রবচন-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রধান যজমান ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রদীপ গর্গ এবং শ্রীমতী সুনীতা গর্গ।

সুপ্রসিদ্ধ ভাগবত কথাকার অতুলকৃষ্ণ ভরদ্বাজ সাতদিন ধরে প্রতিদিন দুপুরে ১টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত প্রবচন দেন। বহু ভক্তপ্রাণ মানুষ প্রতিদিন এই প্রবচন শুনতে উপস্থিত হতেন।

কংগ্রেসই প্রধান শত্রু মমতার

(১ পাতার পর)

বিরোধী দলই সিপিএম নয়, পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছে। সিপিএমকে হঠিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে বাম অপশাসন মুক্ত করার প্রতিষ্ঠা তাই এখন শিকেয় তোলা আছে।

কংগ্রেস ও তৃণমূলের এলাকা দখলের লড়াইতে লাভবান হচ্ছে সিপিএম। ভোট বিভাজনের নীতিতে গত তিন দশকের বেশি বামেরা সর্বস্তরে ক্ষমতা ধরে রেখেছে। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের গণহত্যার পর বাংলার জনমত বামেদের বিরুদ্ধে যেতে শুরু করে। এই জনমতের চাপেই কংগ্রেস—তৃণমূল নেতৃত্ব বাধ্য হয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোট করতে। কিন্তু লোকসভার নির্বাচনে আশাতীত সাফল্য মাথা ঘুরিয়ে দেয় দুই বিরোধী দলের নেতা নেত্রীদের। উভয়েই মনে করে যে জনগণ তাদের চাইছে। অথচ বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, বাংলার মানুষ চাইছে জোটবদ্ধ হয়ে রাজ্য থেকে বামেদের তাড়াতে। তাই কংগ্রেস-তৃণমূলের পারস্পরিক খেয়োখেয়ি দেখে বাম বিরোধী ভোটদাতারা ক্ষুব্ধ। ভোটদাতারা জানেন যে প্রদত্ত ভোটের দুই শতাংশ কাটাকাটিতে বাম প্রার্থীরা জয়ী হবে। লঙ্কা বিজয়ের আগেই কালনেমির লঙ্কাভাগের মতো কংগ্রেস ও তৃণমূল যেভাবে রাজ্যভাগ করছে তা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়। তারা ভুলে গেছে যে রাজ্যজুড়ে জনসমর্থনের জোয়ারেই তাদের মরা গাঙে বান এসেছিল। নিজেদের মধ্যে বখরার লড়াই করে সিপিএমকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনলে জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না।

সংশোধনী

স্বস্তিকা ১০ মে, ২০১০ রবীন্দ্রসংখ্যা ১৪১৭-য় ৭ পৃষ্ঠায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কবিগুরুর নববইতম জন্মদিবস উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণের তারিখটি উনিশ শো সাতান্ন সালের পরিবর্তে উনিশ শো একান্ন সালের ২৫ বৈশাখ পড়িতে হইবে।

২৫ পৃষ্ঠায় ভ্রমবশত 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী' সঙ্গীতটিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলা হয়েছে। গানটি আসলে অতুল প্রসাদ সেনের লেখা। ৩১ পৃষ্ঠায় কোমলগান্ধারে নীতার চরিত্রে সুপ্রিয়াদেবীর অভিনয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কোমলগান্ধারে অভিনয় করলেও নীতার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন 'মেঘে ঢাকা তারা' ছায়াছবিতে।

রাজ্য রাজনীতি

সুকৌশলে কংগ্রেসকে ভাঙার কাজ চলছে

নিশাকর সোম

রাজ্য রাজনীতিতে পৌর নির্বাচন নিয়ে বামফ্রন্ট, তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে লাগাতার দড়ি টানাটানি চলেছে। সিপিএম-দলে প্রতিটি নিধিরাম সর্দাররূপী নেতা নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্ষমতার লড়াইতে মেতে উঠেছেন। কলকাতা জেলা সিপিএম-এ প্রথমে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয় কলকাতা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক তথা গার্ডেনরীচের শিক্ষক দিলীপ সেন ও রবীন দেবকে। পরে জেলা-সম্পাদকমণ্ডলীতে তুমুল বিতর্কে ঠিক হলো—রঘুনাথ কুশারী বাদে সম্পাদকমণ্ডলীর সকল সদস্যের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হবে। কিন্তু কলকাতা জেলার কাজ কেন্দ্রীয় ভাবে চিত্তব্রত মজুমদারের ভাইপো এবং দেবব্রত মজুমদারের পুত্র কল্লোল মজুমদারকে দেওয়া হলো। এই কল্লোল মজুমদারই কলকাতা জেলা পার্টির সম্পাদক হবার দৌড়ে আছেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন দেবব্রত মজুমদার এক সময়ে কলকাতার চীনা কনসুলেটে কাজ করতেন। কল্লোল মজুমদার রাজ্য-নেতৃত্বের প্রিয়ভাজন।

সিপিএম-এর তীব্র লড়াইটা জমে উঠেছে। জেলা সম্পাদক অমিতাভ বসু (বড়দা) যিনি পার্টির কথায় বড় কোম্পানিতে বিরাট মাইনের কাজ ছেড়ে দীনেশ মজুমদারের অনুরোধে পার্টির সারাক্ষণের কর্মী হন। বড়দা আজ খুবই অসুস্থ। সুভাষ চক্রবর্তী প্রয়াত। তড়িৎ তোপদারকে সকলে "রাফ" বলে মনে করেন। কাজেই উত্তর ২৪ পরগণায় সম্পাদকের দৌড়ে এগোচ্ছেন অমিতাভ নন্দী। তিনি সুভাষ চক্রবর্তী গোষ্ঠীকে নির্মূল করে দিতে চান।

এছাড়া কলকাতার ২৮নং ওয়ার্ডসহ বহু ওয়ার্ডে সিপিএম-এর দ্বন্দ্ব জমে উঠেছে। এছাড়া বিকাশ ভট্টাচার্য ও বিশ্বজীবন মজুমদার যথেষ্ট ড্যামেজ করে দিয়েছেন। অপরদিকে তৃণমূল-কংগ্রেস জোট ভেস্তে গেছে। তৃণমূল আগেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে। কংগ্রেসও ১ মে তালিকা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ কংগ্রেস প্রদেশ দপ্তরে ভাঙচুর এবং নেতাদের অনশন-এর চাপ ছিল। এদিকে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়েও জোর গোলমাল হচ্ছে।

এদিকে বামফ্রন্টের আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপি আই এই তিন শরিক সিপিএম-কে 'কাট-টু সাইজ' করতে চায়। কাজেই এই দলগুলি বিরোধীদলের প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট দেবেন। বিশেষ করে পূর্ব কলকাতায় পরেশ পালের পক্ষে আর-এস-পি বরাবরই "মাখন পালের মানসপুত্র"-কে সমর্থন করে থাকে।

এ থেকে এটা স্পষ্ট বামফ্রন্ট কিংবা কংগ্রেস-তৃণমূল—এই দুই পক্ষের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার অর্থ নাগরিক সুখ-সুবিধার গলা টিপে তাদের আখের গোছানোর ব্যবস্থা করা। কাজেই এই দুই গোষ্ঠীকে ভোট দেওয়ার অর্থ নাগরিকদের সর্বনাশ ডেকে আনা। এ-ছাড়া এই দু'পক্ষ দাঙ্গাবাজিতে রাজ্যকে আতঙ্ক এবং সন্ত্রাসের আবহে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাজেই এদের ভোট দেওয়া চলে না।

কলকাতায় তো দেখছি সব রাস্তাগুলো কেটে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কর্তাদের ভোটের লোভে ঘুম ভেঙেছে। শুধু ক্ষমতার লোভ।

তৃণমূল-কংগ্রেস সার্বিক ঐক্য না হওয়ার ফলে রাজ্য কংগ্রেস শাঁখের করাতে পড়েছে। একদিকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের রোষ অপর দিকে সাধারণ-কর্মীদের চাপ। এর ফলে ক্ষমতালোভীরা তৃণমূলেই যাবে কিছু ব্রেড-বাটার পাবার জন্য। পৌর নির্বাচনের পরেও কংগ্রেস আরও ভাঙবে এবং তৃণমূলেও তীব্র মারামারি হবে।

বামফ্রন্টের থেকে আর এস পি বেরিয়ে গিয়ে নকশালদের নিয়ে অন্য বামফ্রন্ট গড়ে তুলবে।

আগামী পৌর নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে নানা পরিবর্তন দেখা যাবে। সবথেকে বড় পরিবর্তনের ধাক্কা আসবে সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্বের উপর। তৃতীয় শক্তির উত্থান-এর ভূমি রচিত হয়েছে। তৃণমূল, কংগ্রেস এবং সিপিএম-এর প্রার্থী তালিকার মধ্যে পরিবারতন্ত্র দেখা যাচ্ছে। তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের স্বামী, স্ত্রী, কন্যা, জামাতা প্রার্থী আর সিপিএম-এর নেত্রীর কন্যা (২৮নং), রবীন দেব-এর ভাইপো প্রার্থী (৪৯নং ওয়ার্ডে) হয়েছে।

অমিতাভ নন্দীর স্ত্রী ইলা নন্দী বিধাননগর-এ চেয়ারপারসন হতে চান! একটা মজার এবং আশ্চর্যজনক ঘটনা—সুব্রত মুখার্জি প্রার্থী হচ্ছেন না! তিনি তো তৃণমূলে যোগ দিয়ে দিলেন। তিনি এবং সোমেন মিত্র কংগ্রেসের কাছে তৃণমূল-এর সীট না-ছাড়ার বুদ্ধি যুগিয়েছেন। সোমেন মিত্র কংগ্রেসকে ভাঙার কাজ অত্যন্ত সুকৌশলে করে চলেছেন। সুব্রত মুখার্জী কি রাজ্যসভায় যেতে চান?

বামফ্রন্ট কিংবা কংগ্রেস-তৃণমূল—এই দুই পক্ষের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার অর্থ নাগরিক সুখ-সুবিধার গলা টিপে তাদের আখের গোছানোর ব্যবস্থা করা। কাজেই এই দুই গোষ্ঠীকে ভোট দেওয়ার অর্থ নাগরিকদের সর্বনাশ ডেকে আনা। এ-ছাড়া এই দু'পক্ষ দাঙ্গাবাজিতে রাজ্যকে আতঙ্ক এবং সন্ত্রাসের আবহে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

অন্য রকম

বীরাঙ্গনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ধরুন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নপত্রে আপনার কাছে জানতে চাওয়া হলো, স্বামী বিবেকানন্দের সবচেয়ে বিতর্কিত মন্তব্য কোনটি? প্রশ্নটা শুনে নিশ্চয়ই বেজায় ঘাবড়ে গেছেন। ভাবছেন স্বামীজী আবার বিতর্কিত মন্তব্য করলেন কবে? ভেবে ভেবে হয়রান হয়ে যাবেন অথচ উত্তরটা খুঁজে পাবেন না। কিন্তু উত্তরটা বলে দিলে নিতান্তই হাত কামড়াতে পারেন, তর্ক করতে পারেন, নিদেনপক্ষে পাত্তা নাও দিতে পারেন।

যাই করুন না কেন, উত্তরটা হবে—'গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভাল।' এমন বিতর্কিত উক্তি গাড্ডায় পড়া বামপন্থীদের সতর্কিত করে দিয়েছিল। তাই স্বামীজীকে বামপন্থী সাজাতে তাদের বক্তব্য ছিল—স্বামীজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে উপেক্ষা করে ফুটবল খেলার পরামর্শ দিয়েছেন। এমন অর্বাচীন মন্তব্যের জবাব দিচ্ছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীরা। যে বৌদ্ধ ধর্মকে স্বামীজী স্বয়ং—'দ্য রিবেল চাইল্ড অব্ হিন্দুইজম' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

কাঠমাণ্ডুর পূব আকাশে যখন সূয্যিমামা উঁকি মারেন তখন দেখা যায় ৮০০ বছর পুরনো 'দ্রুকপা' বৌদ্ধ গোষ্ঠীর নবীন সন্ন্যাসিনীরা তাদের চিরাচরিত খয়েরি রঙের আলখাল্লা খুলে রেখে পায়জামা ও হলুদ রঙের কাপড় পরে, ভিয়েতনামী শিক্ষকের কাছ থেকে 'চপ', 'পাঞ্চ' ও 'রাউন্ডহাউস কিক' শেখেন। নামগুলো বোধগম্য হলো না বুঝি? আরে এগুলো হলো প্রাচীন মার্শাল আর্ট 'কুং ফু'-এর একেক ধরনের কৌশল। ঠিকই শুনছেন, সন্ন্যাসিনীরা মেতেছেন কুং-ফু চর্চায়। প্রায় বছর দু'য়েকের প্রচেষ্টায় 'কুং-ফু' বিদ্যা বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করে ফেলেছেন তাঁরা। এই বিদ্যাই নাকি তাদের একাগ্রতা ও শারীরিক সক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এই 'বাড়িয়ে তোলা'-টা সন্ন্যাসিনীদের পক্ষে অবশ্য খুবই জরুরী। কারণ মঠের বাইরে পা রাখলেই কয়েকটা বখাটে ছেলে উত্যক্ত করতো তাদের। 'কুং-ফু' প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কাছ থেকে আপাতত দূরেই থাকছে তারা।

অমিতাভ পর্বতের ওপর ওই 'দ্রুকপা' মঠটিতে সন্ন্যাসিনীরা ছাড়াও থাকছেন আরও চারশো মহিলা। যদি আপনি ভেবে থাকেন ওই মহিলারা স্রেফ সন্ন্যাসীনীদের রান্না-বান্না ও ধোয়া-মোছার কাজেই ব্যাপৃত রয়েছেন তবে মস্ত ভুল করবেন। ক্যাফে চালানো থেকে শুরু করে গাড়ি চালিয়ে বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনা সবই করছেন তারা। তবে সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনও খেদ নেই তাদের। তাঁরা মনে করছেন—'পুরুষরা এই ব্যবস্থাকে ভালভাবেই গ্রহণ করেছেন'।

কুং ফু-র অনুশীলনে ব্যস্ত সন্ন্যাসিনীরা।

আলফা শান্তি আলোচনা ভেস্তে গেল

বাসুদেব পাল॥ রীতিমতো গাড্ডায় পড়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। পরেশ বরুয়ার (কমাণ্ডার ইন্ চীফ্—ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম) চালে ভালোরকম বেকায়দায়। এবার তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও নাকি সংবাদমাধ্যমের কাছেই-মেল মারফৎ পৌঁছে গেছে। ফলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাম মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ বিভাগ। তবে তরুণবাবু মুখে বলছেন, তিনি অকুতোভয়। প্রাণের ভয় তাঁর নেই।

গত বছর আলফা'র (United Liberation Front of Assam) সভাপতি অরবিন্দ রাজখোয়াসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষস্তরের এবং প্রথম সারির আলফা নেতাকে বাংলাদেশের সহযোগিতায় হাতে পান তরুণ গগৈ তথা অসম সরকার। সবাইকে গ্রেপ্তার করে গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়। তরুণবাবু আশা করেছিলেন এবার ওই নেতাদের একত্রিত করে শান্তিবার্তা শুরু করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিশাল সাফল্য দাবী করে ভোট-বৈতরণী পার হবেন। ধরাছোঁওয়ার বাইরে থাকা আপসহীন পরেশ বরুয়া এবং তস্য শুভাকাঙক্ষী তার বুদ্ধি জীবীরা মুখ্যমন্ত্রীর সেই আশায় জল ঢেলে দিলেন। পরেশ বরুয়া তো প্রথম থেকেই অসমের সার্বভৌমত্বের বিরয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে না রেখে কোনওরকম শান্তি আলোচনার পক্ষপাতী নন। এবার সেই সুর শোনা গেল শান্তি আলোচনার পক্ষে গঠিত অসমীয়া বুদ্ধি জীবীদের মুখেও। অথচ সরকার প্রথম থেকেই বলে আসছে—অসমের সার্বভৌমত্ব বাদে যেকোনও বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার টেবিলে বসার কোনও অসুবিধাই নেই।

যাতে আলোচনার পক্ষে বন্দী বিদ্রোহী আলফা নেতারা একত্র বসে আলোচনা করতে পারেন সেজন্য তাদেরকে কারাগারের একই ঘরে একরাত্রি যাপনের সুযোগও দিয়েছিল অসম সরকার। সম্ভবত, পরেশ বরুয়ার ধমকানি বা হুমকিতে (বিদেশ থেকে) ওই

অরবিন্দ রাজখোয়া

পরেশ বড়ুয়া

জেলবন্দী নেতারা পিছিয়ে যান বা চুপসে যান। দু'জন পরে প্যারোলে ছাড়া পেলেও বাকীরা জেলে ছিলেন বা এখনও আছেন।

আলফার চেয়ারম্যান অরবিন্দ রাজখোয়া, ভীমকান্ত বড়গোহাঞি, শশধর চৌধুরী, চিত্রবন হাজারিকা, প্রণতি ডেকা, রাজু বরুয়া (ডেপুটি কমাণ্ডার ইন্ চীফ্), প্রদীপ গগৈ, মিথিঙ্গা দৈমারি, মৃণাল হাজারিকারা বর্তমানে জেলে।

কয়েকবছর আগে 'পীপুলস্ কমিটি ফর পীস ইনিসিয়েটিভ' গঠিত হয়েছিল এবং যথারীতি অকৃতকার্য হয়েছিল। এবার অতি সম্প্রতি ওই লোকেরাই নতুন উদ্যমে একই কমিটি পুনর্গঠন করে মাঠে নামেন। তবে পরেশ-এর এক চালেই আলফার জেলবন্দী নেতারা কূপোকাৎ।

এখন দেখা যেতে পারে, এই শান্তি প্রক্রিয়ার উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য কি?

গত ৩ মে গুয়াহাটিতে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ জানিয়ে দিয়েছেন, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সরকারের একই অবস্থান রয়েছে—বদল হয় নি। অর্থাৎ সার্বভৌমত্বের শর্তে আলোচনার দাবী বা সম্ভাবনা আবার সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। তবে তিনি এটাও বলেছেন, 'আলোচনার মাধ্যমে আমরা আলফা সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। তবে সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনও আলোচনা হবে না। আলফার সার্বভৌমত্বের দাবীতে অসমের সাধারণ মানুষের কোনও সমর্থনই নেই। রাজবাসী স্বাধীন অসমের পক্ষপাতী নন।' এছাড়া শান্তি আলোচনায় পরেশ বরুয়ার সদিচ্ছা নিয়েও তরুণবাবু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর আরও বক্তব্য, সার্বভৌমত্বের শর্তে আলোচনার দাবী বহু আগেই প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং খারিজ করে দিয়েছিলেন। মধ্যস্থতাকারী কমিটিকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সার্বভৌমত্ব নিয়ে আলোচনা কখনও সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, 'সংবিধানের নির্দেশ মেনে অমাকে চলতে হয়। অতএব, সার্বভৌমত্বের শর্ত বাদ দিয়েই আলোচনা করতে হবে।'

শেষমেশ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এখন নতুন করে সার্বভৌমত্বের শর্ত আরোপ পুরোপুরি অযৌক্তিক। দরকার হলে, পরেশ বরুয়াকে বাদ দিয়েই আলোচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন তরুণবাবু। বলে দেন, 'কারও জন্য আমরা আলোচনার টেবিলে তো আর অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারব না।' বলা বাহুল্য, অদৃশ্য পরেশ বরুয়ার প্রভাব এতটাই যে, তাকে অস্বীকার করা কারও পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশে এখনও জঙ্গি ঘাঁটি গগৈ

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ অরবিন্দ রাজখোয়া, শশধর চৌধুরীদের পর বাংলাদেশের মাটিতে এন ডি এফ বি-র রঞ্জন দৈমারি আটক হলেও (পরে ভারতের হাতে প্রত্যর্পিত) এখনও সে দেশে বহু জঙ্গি ঘাঁটি আছে।

গত ৩ মে এ কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। তাঁর মতে, শেখ হাসিনা সরকার ভারতের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ঠিকই, তবে এখনও প্রতিবেশী বাংলাদেশে ঘাঁটি আছে উত্তর-পূর্বের কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনের।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী গগৈ সেদিন বলেন, বাংলাদেশ যেভাবে জঙ্গি দমনে সাহায্য করছে তাতে অবশ্যই তিনি খুশি। কিন্তু এখনও ওই দেশে আস্তানা রয়েছে এন এস সি এন, কে এল এন এল এফ এবং এন ডি এফ বি-র। এছাড়া মায়ানমারেও কিছু জঙ্গি শিবির আছে বলে জানিয়েছেন তরুণবাবু।

জনজাতিদের লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অসমের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার সদর শহর হাফলং-এ সম্প্রতি-ডিমাসা বাদে অন্যান্য জনজাতি

হাফলং-এ ইণ্ডি জেনাস উইমেন ফোরামের মিছিল।

বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর মহিলারা জেলা ভাগ করার দাবীতে মিছিল করলেন। শান্তিপূর্ণ মিছিলটি আকারে বেশ বড়ই ছিল।

প্রসঙ্গত, অসমের বেশ কয়েকটি জেলা জনজাতি প্রধান। এক-একটি জেলাতে এক একটি জনজাতির প্রাধান্য এবং সংখ্যাধিক্য রয়েছে। রয়েছে নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী। ভারত-বিরোধী বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থবাদীরা ওই সরল জনজাতিদের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র আশ্রয়-প্রশ্রয়, প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে দম দিয়ে রাষ্ট্রের তথা রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিচ্ছে। এই লড়াইয়ের বিষয়টা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। যার ফলশ্রুতি লালডেঙ্গা ও ফিজো। ৬০-৭০-এর দশকে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিরাপত্তা বাহিনীকে দিয়ে কড়া হাতে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। আরও পরে রাজীব গান্ধীর সময়ে ওই বিদ্রোহীদের কয়েকজনকে ডেকে এনে 'জামাই আদর' করে পারোক্ষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বলা বাহুল্য, এদের প্রায় সবাই ধর্মে ক্যাথলিক খৃস্টান হওয়ার কারণে চার্চের একটা ভূমিকা থেকে গেছে। নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয় এবং অন্য চারটি রাজ্যের কিছু কিছু অঞ্চলে চার্চ তথা খৃস্টান একাধিপত্য অস্বীকার করা যায় না। উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলাসহ অসমের বেশ কয়েকটি জনজাতি প্রধান জেলাকে ইতিমধ্যে স্বশাসিত জেলার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায় ডিমাসা জনজাতিদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। তবে অন্যান্য জনজাতিদের সংখ্যাটাও কম নয়। সম্প্রতি ডিমাসারা জেলার নাম বদলে 'ডিমাহাসি' রাখার দাবী করে। সরকারও মেনে নেন। এতেই অন্যরা প্রমাদ গোণে। কেননা ডিমাসা জনজাতিদেরও একটি জঙ্গি গোষ্ঠী রয়েছে ডি এইচ ডি বা ডিমা হালাম দাওগা। গঠিত হয় ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্ট ফোরাম এবং এন সি হিলস্ ইন্ডিজেনাস উইমেন ফোরাম। স্টুডেন্ট ফোরাম ধর্নায় বসে—দাবী, জেলাকে দু'ভাগ করতে হবে। ডিমাসাদের জেলায় অডিমাসা জনজাতিরা থাকতে পারবে না। গতবছর ডিমাসা ও নাগা জনজাতিদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ঘটে গেছে জেলায়। অনেক প্রাণহানি ও স্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। অথচ উভয়েই হিন্দু। ছাত্রদের ধর্নায় পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। ১৪৪ ধারা জারি হয়ে যায়।

এতদ্সত্ত্বেও ওইদিন উইমেন ফোরামের মিছিলের অনুমতি দেয় প্রশাসন। কড়া পুলিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে মিছিল শেষ হয়। মহিলারা জেলা-শাসক দিলীপ বরঠাকুরের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে নিরীহ পিকেটারদের উপর গুলি চালনার তদন্ত দাবী করে আহতদের এককালীন দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে। মহিলাদের বক্তব্য—ম্যাজিস্ট্রেট-এর অনুমতি ছাড়াই গুলি চলেছে। যার নির্দেশে গুলি চলেছে তাকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে।

ভারতকে টুকরো টুকরো করার গভীর এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। আর দাবার ঘুঁটি করা হচ্ছে স্বধর্মনিষ্ঠ নিরীহ জনজাতিদের। তাদেরকে নানাভাবে গোষ্ঠীচেতনার মাধ্যমে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে ডিমাসা ও নাগা জনজাতিরা সৌহার্দ্যের সঙ্গে একত্র পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে। ডিমাসাদের মূল বাসভূমি তো নাগারাজ্যের ডিমাপুর। অনেক ডিমাসারা নিজেদেরকে মহাভারতের যুগের ভীমমহিষী হিড়িম্বার বংশজ বলেও মনে করে গর্ববোধ করেন।

পূর্ণকুম্ভের সাফল্যেই বর্ষপূর্তি পোখরিয়াল সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আপাতত নিঃশঙ্ক চিত্তেই কবিতা লেখার তোড়জোড় করতে পারেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল। রাজনৈতিক একটা পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবি হিসেবেও তিনি সমাদৃত। নিঃশঙ্ক চিত্তে কবিতা লেখার কারণ তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বের একটি বছর পূর্ণ হলো সম্প্রতি। ২৮ এপ্রিল শেষ হয়ে যাওয়া পূর্ণকুম্ভ অসংখ্য দেশবাসীর জন্য কতটা পুণ্য সঞ্চ য় করতে পারল তা তর্কের বিষয় হলেও এই পূর্ণকুম্ভকে সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিঃশঙ্কের সাফল্য নিয়ে কোনও বিতর্কের অবকাশ নেই। পোখরিয়াল নিজে অবশ্য তাঁর সতীর্থদের সঙ্গেই যাবতীয় কৃতিত্বটা ভাগ করে নিতে চাইছেন। তাঁর কথায়—"আমার এই সাফল্যের জন্য আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমার সহকর্মী ও রাজ্যবাসীকে, মূলত যাঁরা হরিদ্বারে থাকেন তারা যেভাবে প্রশাসনকে সাহায্য করেছেন তাতে কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।"

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে এটাও স্বীকার করে নিচ্ছেন—এবার পূর্ণকুম্ভের আয়োজন করাটাই বেশ চ্যালেঞ্জ ছিল। তবে সরকার খুব ভালভাবে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করায় আপাতত হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন তিনি। এই মহাকুম্ভের সাফল্যে শুধু সরকার-ই নয়, গর্বিত হয়েছেন রাজ্যবাসীও। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই, সেইসাথে পৃথিবীর নানা দেশের পর্যটক এবার পা রেখেছিলেন উত্তরাখণ্ডে। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি রাজ্যবাসীরও ঐকান্তিক সহযোগিতার প্রশংসায় পঞ্চ মুখ হয়েছেন তাঁরা। দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যম বিশেষ করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দৌলতে এসব দেখে-শুনে বেজায় খুশি রাজ্যবাসীও। রমেশের হিসেব অনুযায়ী, ১৪০টি দেশের ৬ কোটিরও বেশি মানুষ এবার এসেছিলেন পূর্ণকুম্ভে।

এবারের পূর্ণকুম্ভ যদি উত্তরাখণ্ড সরকারের একটা মাইল-ফলক হয়, তবে দ্বিতীয়টা অবশ্যই রাজ্যের অর্থনৈতিক

পোখরিয়াল

উন্নয়ন। যে উন্নয়নের পক্ষে কয়েকটি মোক্ষম প্রমাণ হলো, উদ্বৃত্ত রাজস্ব (সারপ্লাস রেভিনিউ) আদায়, ট্যাক্স-মুক্ত বাজেট ঘোষণা। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হলো, দেশব্যাপী অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজ আপাতত থমকে রয়েছে। এর একটা কারণ যদি হয় ভারতীয় অর্থনীতির শ্লথ গতি, তবে অপর কারণটা অবশ্যই ভোটের তাগিদ। যে তাগিদ অর্থনৈতিক সংস্কারের পথ অনেকটাই রুদ্ধ করে দিয়েছে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে বিকাশনগর উপনির্বাচনে বিজেপির জয় পোখরিয়ালের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল অনেকটাই। তাঁর নিজের কথায়—"এটা আমার জীবনের একটা অত্যন্ত গৌরবময় মুহূর্ত। এই জয়টাই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল রাজ্যবাসীর বিশ্বাস রয়েছে আমাদের ওপর এবং আমরাও সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পেরেছি।" এখন থেকেই ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের অ্যাজেন্ডা কিংবা স্লোগান যাই বলুন না কেন (রমেশ পোখরিয়াল অবশ্য বললেন যে এটা মন্ত্র) সেটা হচ্ছে—'গাঁও গাঁও ঘর ঘর চলো।'

সম্প্রতি কেন্দ্রের তরফ থেকে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশের মধ্যে যে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্যাকেজ' রয়েছে তা পুনর্নবীকরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে রমেশ পোখরিয়াল জানান, তাঁর সঙ্গে হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী পি কে ধূমলের কথা হয়েছে। পার্বত্য রাজ্যগুলোতে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্যাকেজে'র সুফল পৌঁছে দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। একইসঙ্গে পোখরিয়াল জানিয়েছেন, তাঁরা প্রতিনিয়ত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছেন এবং তিনি আশাবাদী খুব শীঘ্রই এব্যাপারে ভাল কোনও খবর রাজ্যবাসীকে তাঁর সরকার উপহার দিতে পারবে। এই ভাল খবরে'র ব্যাপারে যেটুকু সংবাদ মিলছে তা রাজ্যবাসীকে নিঃসন্দেহে উল্লসিত করবে, যেমন—এন আই টি, আই আই এম, এ আই আই এম এস-এর মতো আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালু হতে চলেছে উত্তরাখণ্ডে।

উত্তরাখণ্ডের সরকারের আরও একটা উল্লেখযোগ্য কাজ হলো গঙ্গা রক্ষায় উদ্যোগী হওয়া। গত বছরের ডিসেম্বরেই 'স্পর্শগঙ্গা' নামক একটি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। এখন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন তাঁরা স্বয়ংশাসিত গঙ্গা রক্ষা পর্ষদের সূচনা করবেন অবিলম্বে। এ নিয়ে কেন্দ্রের সাহায্যের ব্যাপারেও তাঁরা প্রত্যাশী। যে গঙ্গা উত্তরাখণ্ডকে এত দিয়েছে (এই পূর্ণকুম্ভ যার সবচাইতে বড় প্রমাণ), তাকে কিছু ফিরিয়ে দেবে না বিজেপি পরিচালিত সরকার? তাই কখনও হয়?

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ নীতিশ-শিবরাজের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একযোগে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ হানলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। জাগরণ মঞ্চে র পক্ষ থেকে গত ৪ মে রাজধানীতে আয়োজিত 'কোয়ালিশান গভর্ণমেন্ট অ্যাণ্ড র‍্যাপিড গ্রোথ' শীর্ষক আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখছিলেন ওঁরা। আলোচনাসভায় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে উভয়ের মতামতেই সাযুজ্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাঁরা দু'জনেই চেয়েছেন লোকসভা, বিধানসভা এবং স্থানীয় পঞ্চ ায়েত ও পুরসভার নির্বাচন একইসঙ্গে করা হোক। যারা নির্বাচিত হবেন তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী কার্যসীমা নির্ধারিত করা এবং নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল গড়ার কথাও উঠে এসেছে তাঁদের বক্তব্যে। এর যুক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এতে দেশবাসীর ঘাড়ে অতিরিক্ত ব্যয়-ভারের বোঝা চাপবে না, সর্বোপরি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঘোড়া কেনা-বেচার প্রবণতাটাও একেবারেই কমে আসবে। মানে রাজনীতির অ-ব্যবসায়ীকরণের একটা প্রচেষ্টা ছিল দুই মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়।

কেন্দ্রীয় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে নীতিশ কুমার বলেছেন—"কেন্দ্রীয় সরকার বুন্দেলখণ্ডের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজে অনুদান প্রদান করেছিল। কিন্তু কোশীর বন্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়ে গেলেন তার বেলায় একটা পয়সাও ঠেকাল না কেন্দ্র। কেন্দ্রের কি উচিত ছিল না যে ওই গৃহহারা মানুষদের পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করা?" নীতিশের আরও অভিযোগ—নদীর চরে বালি জমে বিহারের বেশ কিছু কৃষিক্ষেত্রের বারোটা বেজেছে। নীতিশের প্রশ্ন—"কেন্দ্রীয় সরকারের কি উচিৎ ছিল না বিকল্প কৃষি-ব্যবস্থা চালুর জন্য রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা? সারা দেশের ক্ষেত্রেই যে কোনও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিকোণ সমান হওয়া উচিৎ। পক্ষপাত ছাড়াই কোনও সরকারের কাজ করাটা ভারতের মতো বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের পক্ষে একান্তই জরুরী।

এছাড়াও শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকরী করতে নীতিশ কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। বিশেষ করে রাজ্য সরকারের অর্থ যুক্ত রয়েছে এমন কিছু প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন দিতে কেন্দ্র অহেতুক টালবাহানা করছিল। নীতিশের বক্তব্য, বিহারে ভারতীয় জনতা পার্টি ও সংযুক্ত জনতা দলের মোর্চা সরকার খুব ভালভাবে সবকটা পড়ে থাকা প্রকল্পের রূপায়ণে আন্তরিকভাবে অগ্রসর হয়েছে এবং এই কোয়ালিশন সরকারের মাধ্যমে 'সামাজিক ভারসাম্য'-এর ব্যাপারটা প্রতিফলিত হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান অভিযোগ করেন—রাজ্যে মহেশ্বর জলাধার তৈরি করতে গিয়ে কেন্দ্রিয় অনুমোদন পেতে তাঁদের কালঘাম ছুটে গেছে। তাঁর কথায়—"প্রকল্পটাকে আমরা প্রায় শেষ করে এনেছিলাম, এটা সম্পূর্ণ হলে এর থেকে ইন্দোর ও দেবাস-এ জল যাবার কথা। কিন্তু আচমকাই এনিয়ে কেন্দ্র সাহায্য বন্ধ করে দিল। যদিও এটা কেন্দ্রিয় প্রকল্পেরই একটা অঙ্গ। কিন্তু যেভাবে বিনা নোটিশে আচমকা কাজ বন্ধ হলো, তাতে মনে হয় না

নীতিশ কুমার

শিবরাজ সিং চৌহান

যে সবকিছু ঠিক-ঠাক চলছে বলে।"

শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে নীতিশের মতোই কেন্দ্রীয় অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন শিবরাজ। তাঁর বক্তব্য—"আমার রাজ্যে (মধ্যপ্রদেশ) ৪৮ শতাংশ মানুষই দরিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন। সেই কারণে শিক্ষার অধিকার আইন এখানে কার্যকর করবার জন্য প্রথম বছর কেন্দ্রের কাছ থেকে ১৩,০০০ কোটি টাকার সাহায্য চেয়েছিলাম। নইলে টাকাটা আসবে কোত্থেকে? এখনই এই টাকাটা আমরা দিলে রাজ্যে উন্নয়নের গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে।" বলাই বাহুল্য, সেই টাকাটা আসেনি। এবং উন্নয়নের গতি যাতে না রুদ্ধ হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার। এদিকে মাওবাদী সমস্যা নিয়ে কেন্দ্র শুধু পরামর্শ আর বাহিনী পাঠিয়েই তাদের কর্তব্য সেরেছে। কিন্তু যে দারিদ্র্য আর অশিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে জনজাতিদের ওস্কাচ্ছে মাওবাদীরা সেদিকে তাদের কোনও হুঁশ নেই। এনিয়ে মাওবাদী সমস্যা কবলিত মধ্যপ্রদেশের সরকার বারংবার কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেও তাতে পাত্তা দেওয়ার কোনও প্রয়োজনই অনুভব করেনি মনমোহন-চিদাম্বরম সরকার। বোধহয় 'দান্তেওয়াড়া' না হলে হুঁশ ফেরে না ইউ পি এ সরকারের।

পুরভোটের ত

একান্ত সাক্ষাৎকার   বিকাশ ভট্টাচার্য

স্বীকার করেই নিলেন পুরসভার সীমাবদ্ধতা

শু আপনি এবার পুরভোটে না দাঁড়িয়ে বিরোধীদের ঠিক কতটা সুবিধে করে দিলেন?

প্ত ঠিক উল্টো। এতে বিরোধীদের কিছুই সুবিধে হবে না। তারা বরং বামফ্রন্টের মেয়র কে হচ্ছে তা নিয়ে অন্ধকারে হাতড়াবে এবং সেই অজানা আশঙ্কায় বিরোধীদের বুক দুরু দুরু কম্পমান হবে। আমি চলে যাওয়ায় বিরোধীরা অনেক অসুবিধায় পড়ে যাবে।

শু সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতে ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আপনাদের পার্টির তৎকালীন সম্পাদক প্রয়াত অনিল বিশ্বাসের দাওয়াই ছিল— নির্বাচনে 'নতুন মুখ'-কে প্রার্থী করো। এবারের পুরভোটে অনিল বিশ্বাসের সেই নীতি-ই কি অনুসৃত হলো?

প্ত সেই নীতি যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের সাথে কথা বলাটাই বাঞ্ছনীয়। তাঁরা কি ভেবেছেন, না ভেবেছেন তার উত্তর আমার দেওয়া ঠিক হবে না।

শু আপনি 'পুরো সময়ে'র নন, 'আংশিক সময়ে'র মহানাগরিক। গত পাঁচ বছর ধরে যে অভিযোগটা শুনে এসেছেন, আজ বিদায় বেলায় দাঁড়িয়ে তার কোনও জবাব দিতে ইচ্ছে করছে?

প্ত সত্যি কথা বলতে কি, এই 'আংশিক সময়' বলতে কি বোঝানো হয়েছে, তার সম্বন্ধে আমি সম্যক অবহিত নই। মেয়র হিসেবে আমার যে পরিমাণ সময় দেওয়া দরকার, আমি জোর গলায় বলতে পারি— পূর্বতন যে কোনও মেয়রের থেকে আমি বেশি সময় দিয়েছি। কেউ যদি তার অতিরিক্ত সময়টা অন্য কোনও কাজে ব্যয় করেন তাহলেই তিনি 'আংশিক সময়ে'র মেয়র হয়ে যান না। আমার আগের মেয়ররা নিশ্চয়ই সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত অফিসে বসে থাকতেন না। তারাও মেয়রের কাজটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করতেন। তারপর তারা নিশ্চয়ই অন্য কিছু করতেন। কেউ হয়তো গালগল্প করতেন, কেউ বা ট্রেড-ইউনিয়ন করতেন। আমি সেই অতিরিক্ত সময়টায় আদালতে গেছি। এতে গুণগত ফারাক তো কিছু হবার নয়। মোদ্দা কথা হলো, আমি আমার সময়টাকে মেয়রের কাজে সঠিকভাবে ব্যয় করছি কিনা। এতে হাফটাইম-ফুলটাইম-পার্টটাইমের প্রশ্ন যুক্ত হয় না।

শু সিপিএমের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরের দিনই আপনি বলেছিলেন, বহু কিছু

> "দালাল চক্র আমি তো সঙ্গে করে আনিনি। এটা আমি পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে। তবে প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনার জন্য, দালাল চক্রকে তাড়ানোর জন্য আমরা বৈদ্যুতিন প্রশাসনের সাহায্য গ্রহণ করেছি।"

করার ইচ্ছে থাকলেও স্রেফ সদিচ্ছের অভাবে অনেক কিছুই করতে পারেননি। বিরোধীদের প্রতি আক্রোশ আর নিজের পার্টির প্রতি অভিমান—দুটোই ধরা পড়েছিল আপনার বক্তব্যে। কিছু বলবেন?

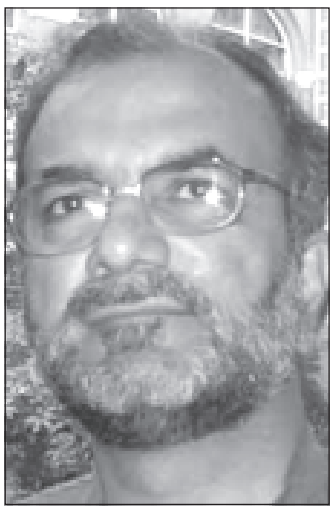

প্ত মুশকিল হচ্ছে কি জানেন তো, আমার কথার ব্যাখ্যা যখন অন্য লোক করতে যায় তখন তার মনোভাবটাই সেখানে প্রস্ফুটিত হয়। আমি যা বলেছি তা প্রকাশ্যেই বলেছি। আমার কথা যদি কোনও সাংবাদিক নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করতে চান, তার দায় তো আমার নয়।

শু পুরসভার প্রাক্তন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন যে তাঁর আমলে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে সমর্থ হয়েছিল কলকাতা পুরসভা, আপনার সময় তার কিয়দাংশও নাকি আদায় করা যায়নি। অভিযোগের কোনও জবাব দেবেন?

প্ত সুব্রতবাবু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কাগজপত্র না দেখে এসব কথা বলেছেন। কেননা আমার আমলে রাজস্ব যা সংগৃহীত হয়েছে তা গোপন করার কোনও ব্যাপার নেই। কারণ সব প্রমাণ-ই রয়েছে কাগজ-কলমে। সেই কাগজ-পত্র দেখলে উনি জানতে পারবেন ওঁর আমলে যে পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে, আমার আমলে তার থেকে প্রায় দেড়শ শতাংশ বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে। সেই কারণে কম্পট্রোলার অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) আমার সময়ে প্রত্যেকবারই আমাদের প্রশংসা করেছেন, আর ওনার সময়কার নিন্দা করে বলেছেন যে পুরসভার সম্পত্তি পুরসভার স্বার্থের বিরুদ্ধে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার আমলেই ত্রিসল বলে একটি আন্তর্জাতিক ট্রেডিং সংস্থা বলেছে আমরা এতদিন এ স্টেবিলে ছিলাম, এখন সেখান থেকে এ পজিটিভে গিয়েছি। অর্থাৎ (রাজস্ব আদায়ে) উন্নতি হয়েছে। এতসব তথ্য থাকার পরেও কেউ যদি দাবী করেন যে রাজস্ব আদায় হয়নি, তবে তার প্রতি আমার করুণা বর্ষণ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

শু গত পাঁচ বছরে রাজস্ব আদায়ের সঠিক পরিসংখ্যানটা জানা যাবে?

প্ত বিস্তারিত পরিসংখ্যান আমাদের তথ্যভাণ্ডারে রয়েছে। তবে এটুকু বলতে পারি যে সুব্রতবাবু তাঁর বাজেট শুরু করেছিলেন ৮৫০ কোটি টাকা দিয়ে, আমি শেষ করছি ৩২০০ কোটি টাকা দিয়ে। এই বিশাল অতিরিক্ত টাকার সবটাই কিন্তু রাজস্ব আদায় মারফত এসেছে।

শু এমনও তো হতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে আপনারা মোটা টাকার একটা অনুদান পাচ্ছেন যেহেতু সেটা আপনাদের পার্টিরই সরকার। কিন্তু তাঁর আমলে এক্ষেত্রে তো সুব্রতবাবু বঞ্চিতই ছিলেন। অভিযোগ স্বীকার করবেন?

প্ত চিত্রটা একেবারেই উল্টো। সুব্রতবাবুর সময় কলকাতা পুরসভার সরকারি নির্ভরতার পরিমাণ ছিল শতকরা চল্লিশ ভাগ। আমরা সেটা কমিয়ে এনেছি শতকরা তিরিশ ভাগে।

শু এই নির্ভরতটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই কমালেন?

প্ত অবশ্যই। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করেছি, পরিকল্পনা খাতে সঠিক ব্যয় করেছি, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের টাকার স্বদ্-ব্যবহার করেছি। তবেই না নির্ভরতাটা কমেছে!

শু সুব্রতবাবুর সময় উদ্বৃত্ত রাজস্বের (সারপ্লাস রেভিনিউ) যে কথাটা বলা হোত, সেটা তবে কি?

প্ত পুরো ভাঁওতা। সুব্রতবাবু যাওয়ার সময় শেষ যে বাজেটটা পেশ করেছিলেন তাতে দেখবেন প্রায় একশ তেরো-চৌদ্দ কোটি টাকার ঘাটতি ছিল। সুতরাং ঘাটতি-বাজেটের কথা উনিই তো স্বীকার করে নিয়েছেন।

শু বে-আইনি বাড়িগুলোকে আইনী স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বাড়িয়েছেন? বিরোধীরা কিন্তু এমনই অভিযোগ করছেন।

প্ত আমাদের আমলে তিনশ' বে-আইনি বাড়ি ভাঙা হয়েছে। সুব্রতবাবুরা যদি দেখাতে পারেন যে ওঁদের আমলে তিনটে বে-আইনি বাড়িও ভাঙা হয়েছিল, তাহলেই অভিযোগের আমি গুরুত্ব দেব। নাহলে অভিযোগের গুরুত্ব দেওয়ারই প্রয়োজন নেই। (একটু চুপ করে) আর এই যে স্টিফেন কোর্টের অগ্নিকাণ্ড নিয়ে এত কথা উঠল, সেই স্টিফেন কোর্টটা কার আমলে তৈরি হয়েছিল? ১৯৭৫ সালে, যখন সুব্রতবাবু পুরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন তখনই এটা তৈরি হয়। তাই বাজে অভিযোগ করে কোনও লাভ নেই।

শু কিন্তু বে-আইনি বাড়িগুলোকে ঘিরে যে অবৈধ দালাল চক্র গড়ে উঠেছে সেটা ভাঙতেও তো আপনারা কোনও ব্যবস্থা নেননি।

প্ত দেখুন, দালাল চক্র আমি তো সঙ্গে করে আনিনি। এটা আমি পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে! তবে প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনার জন্য, দালাল চক্রকে তাড়ানোর জন্য আমরা বৈদ্যুতিন প্রশাসনের সাহায্য গ্রহণ করেছি। এই ই-গভর্নেন্সের মূল উদ্দেশ্য দালাল চক্রের হাত থেকে মানুষকে রেহাই দেওয়া। কলকাতা পৌর-প্রশাসন পরিচালনায় এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য যা ইতিপূর্বে ওঁরা কল্পনাই করেননি।

শু কিন্তু পুর-বাজারগুলোর বেহাল পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারলেন না কেন?

প্ত বেহাল পুর-বাজারগুলোর হাল ফেরাতে আমরা পি পি পি মডেলের (প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ) সাহায্য নিয়েছি। যেমন—কলেজ স্ট্রীট মার্কেট গড়ার জন্য এই মডেল ব্যবহার করেছি। পার্ক-সার্কাস মার্কেট করার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাই নিয়েছিলাম। মাঝখানে কিছু লোক বাধা দেওয়ার জন্য এইসব কাজ কিছুটা থমকে গেছে।

শু বিদায়বেলায় মানুষকে কি এই আশ্বাস দেওয়ার জায়গাটায় রেখেছেন যে আপনি না থাকলেও কাজ থমকে থাকবে না? মানে আপনি এবার আর মেয়র হচ্ছেন না। আপনার পার্টিও যদি কলকাতা পুর-প্রশাসনে আর ক্ষমতায় ফিরতে না পারে তবে বিরোধীরা কি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে আদৌ উদ্যোগী হবে? কি মনে হচ্ছে?

প্ত আমাদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের যা রীতি-নীতি তাতে আমার শুরু করা কাজ বিরোধীরা শেষ করতে দেবেন না এমনটা আপাতত ভাবছি না। তবে এই রীতি-নীতি মানা, না-মানার ব্যাপারটা ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের এখানে সব কাজ তো শুরু হয়ে গেছে, মাঝপথে তা বন্ধ করার দুঃসাহস কেউ দেখাবেন না।

শু আপনি ব্যক্তিগত কাজে ফেরার পরে এব্যাপারে উদ্যোগী হবেন?

প্ত কেন হবো না? নিশ্চয়ই হব।

শু আপনার আমলে কলকাতা পৌর-প্রশাসনের সাফল্যের দশটি দিক যদি চিহ্নিত করতে বলা হয়, তবে কোন্ কোন্ বিষয়গুলোকে বাছবেন?

(এরপর ১৪ পাতায়)

তরজার কেন্দ্র ঃ কলকাতা পু

ইনি আর মেয়র হচ্ছেন না। ওনারও দাবী মেয়র হবার স
বিরোধীরা অসুবিধায় পড়ে যাবে। ওনার পাল্টা জবাব, 'য
উনি একটা বেআইনি বাড়িও ভাঙেননি। ওনার পাল্টা চ্যালে
তাই একটারও জল বন্ধ করেননি। তরজা-পাল্টা তরজায় স্বা
পুরসভার বিদায়ী মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আর উনি
দু'জনের জমে ওঠা তরজার হটকেকে কামড় বসা

জার কেন্দ্র ঃ কলকাতা পুরসভা

মেয়র হবার সম্ভাবনা নেই। ইনি বলছেন, আমি গেছি তাই টা জবাব, 'য পলায়তি স জীবতি'। ইনি চ্যালেঞ্জ করছেন, র পাল্টা চ্যালেঞ্জ, ইনি কর আদায় করতে নিচেষ্ট ছিলেন, ল্টা তরজায় স্বস্তিকা-র পাতায় অবতীর্ণ ইনি মানে কলকাতা চার্য আর উনি মানে প্রাক্তন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়। ক কামড় বসালেন আমাদের প্রতিনিধি অর্ণব নাগ।

একান্ত সাক্ষাৎকার ■ সুব্রত মুখোপাধ্যায়

দুঃখ কেবল মেয়র ঠিক করে পার্টি, জনগণ নয়

❑ আরও একবার আপনার দল বদল হলো, যার অনেকরকম ব্যাখ্যা হতেই পারে। কিন্তু রাজনীতিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রশাসক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কি কোথাও একটা দ্বন্দ্ব বাধছে? নইলে রাজনীতিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় বারবার কেন নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন করে প্রশাসক হবার মরীচিকার পেছনে ছুটবেন?

● আমার খুবই অশালীন মনে হয় শর্তসাপেক্ষে কোথাও যাওয়া। যেমন আমাকে মেয়র করো, আমি যাব। এই ধরনের কথা বলে আমি কিন্তু তৃণমূলে যাইনি। কংগ্রেস করতে পারছি না তাই গিয়েছি। এর পেছনে কোনও দ্বন্দ্ব নেই।

❑ কিন্তু কলকাতাবাসী মনে করছেন, পুরসভার নির্বাচন চুকলে আপনিই মেয়র হবেন। কোনও কাউন্সিলার পদত্যাগ করবেন ও তার জায়গায় আপনি নির্বাচিত হবেন। মেয়র হবার ছ'মাসের মধ্যে কোথাও থেকে জিতলেই তো হলো!

● দেখ, আমাকে তো অনেকেই চায়। তাই হয়তো এই গল্পটা বাজারে আছে। কিন্তু আমার মনে হয় না, মেয়র হবার আর কোনও সম্ভাবনা আছে বলে। আসলে এখানে হাজার বলেও আমি ডাইরেক্ট ইলেকশন করাতে পারিনি। কলকাতাবাসী আমাকে মেয়র পদে চাইতে পারেন, কিন্তু তাদের হাতে সেই ক্ষমতাটা দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে পার্টির হাতে। পৃথিবীর বহু দেশে, এমনকী ভারতবর্ষেরও অনেক জায়গায় মেয়র সরাসরি নির্বাচিত হন। অর্থাৎ মেয়রকে এক্সিকিউটিভ অথরিটি যেমন দিয়েছ, তখন তাকে পলিটিক্যাল সাপোর্ট-টাও কিন্তু দিতে হবে। যে-ই নির্বাচিত হোক না কেন, সে যদি সরাসরি নির্বাচিত হয় তবে সে ইনডিপেনডেন্ট অথরিটি, দলদাস তাকে হতে হবে না। কর্পোরেশনের মেয়র মানে একটা দায়িত্ব, যেখানে দলদাস হয়ে কাজ করা যায় না। এতে জনগণের সুবিধে, তারা মেয়রকে ক্যাচ করতে পারবে। কাজ করতে পারলে মেয়র থাকবে, নইলে সরে যাবে। অর্থাৎ মেয়রকে পরিবর্তন পার্টি করবে না, জনগণ করবে। এই সিস্টেমটা পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে এসে গেছে; ভারতেও হায়দরাবাদে, গুজরাটের মতো অনেক জায়গায় এসে গেছে। এখানেও এলে অবশ্যই দাঁড়াতাম। তারপর আমার আবার আসনটা মহিলা হয়ে গেল। আমার কাছে এটা খুব রুচিবিরুদ্ধ যে এ আসন, সে আসন ঘুরে-ফিরে দাঁড়ানো। দাঁড়াতে চাইলে দাঁড়াতেই পারতাম। কিন্তু আমার এখন যা পলিটিক্যাল কন্ডিশন তাতে মেয়র পদে বাদে আর অন্য কোনওভাবে দাঁড়ানো যেত না।

❑ অর্থাৎ প্রশাসক সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে মেয়র না হবার একটা যন্ত্রণা বিদ্ধ করছেই?

● হ্যাঁ, একটা যন্ত্রণা তো হয়ই। কারণ স্ট্রং পলিটিক্যাল উইল-এর মধ্যে দিয়ে আমি কলকাতা পৌর-প্রশাসনের মৌলিক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। প্রশাসন নড়বড়ে হলে তুমি কোনও বড় ও শক্ত কাজ করতে পারবে না। যেটা সিপিএম সরকারের হয়েছে। ওদের রাইটার্সটাই নড়বড়ে। তাই ওদের দিয়ে আর ভাল কাজ কিছু হওয়া সম্ভব নয়। একটা সময় ছিল যখন কলকাতা কর্পোরেশনকে বলা হোত চোরপোরেশান। মানে সেখানে এতটাই কোরাপশান (দুর্নীতি) ছিল। আমি দেখলাম এজন্য খালি দু-একটা লোককে পানিশমেন্ট (শাস্তি) দিয়ে কোনও লাভ নেই। আমি তখন মৌলিক পরিবর্তনের একটা চেষ্টা করলাম। যাতে সিস্টেম নিজেই এই দুর্নীতিটা কমিয়ে দিতে পারে। আমি যখন বেলা বারোটার সময় কর্পোরেশনে যেতাম তখন দেখতাম হাত ধরাধরি করে একদল লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবতে শুরু করলাম এরা কেন বেরিয়ে যায়? পরে দেখলাম, সবটাই ওই লোকগুলোর দোষ নয়; আসলে কর্পোরেশনে যে যখন এসেছে সেই একগাদা লোক ঢুকিয়েছে। তাই ওদের কোনও কাজ নেই। এসে খালি সই মারে। তারপর কালেকশান, হ্যান-ত্যান ইত্যাদির নাম করে বাড়ি কেটে পড়ে। আমি এখানে একটা মৌলিক পরিবর্তন করলাম। কাউকেই তাড়িয়ে দিলাম না, কিন্তু যে যে জায়গায় লোকের সত্যিই অভাব সেখানে ওই লোকগুলোকে পাঠিয়ে দিলাম। এতে কাজ বেশি লোক কম কিংবা লোক বেশি কাজ কম—এই ভারসাম্যহীনতাটা বন্ধ হলো। দুর্নীতির আরেকটা দিক হলো পেমেন্ট সংক্রান্ত। ডাইরেক্ট পেমেন্টের পরিবর্তে আমি চেকের মাধ্যমে পেমেন্ট চালু করলাম। যাতে সুদখোর মুনাফাখোরেরা সাধারণ কর্মচারীদের কাছ থেকে টাকাটা না কেড়ে নিতে পারেন। প্রচুর রিটায়ার্ড লোক মরে যাওয়ার পরও পেনশন পেতেন না। আমি রিটায়ারমেন্টের দশদিনের মাথায় তাদের পেনশনের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলাম। আমি ইউনিয়নবাজি ছাড়াই কর্মীদের ন্যূনতম চাহিদাগুলো মিটিয়েছি। পেনশন ছাড়াও মেডিক্লেম, কো-অপোরেটিভের টাকা প্রচুর পরিমাণে দিয়েছি, গৃহনির্মাণের ঋণ যাতে তাড়াতাড়ি মঞ্জুর হয়, সেই বন্দোবস্ত করেছি। এমনও দেখেছি পুরসভার নাম্বার ওয়ান ডিপার্টমেন্টের এক বড় অফিসার হলেন দুর্নীতিগ্রস্ত আর ফাঁকিবাজ। এটা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলে দিয়েছিলাম—আপনাকে আর কাল থেকে আসতে হবে না। এক তারিখে এসে মাইনেটা নিয়ে যাবেন। এভাবে কাজে বসিয়ে দেবার পর দু'মাস যেতে না যেতেই সে কেঁদে এসে পড়ল। শুধু ভয় দেখিয়ে নয়, কর্মীদের চাহিদাগুলোকে সেইসাথে পূরণ করে একটা মৌলিক পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু গত পাঁচ বছরে ইউনিয়নবাজি করে পুরো সিস্টেমটারই এরা বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। এটা খুবই ব্যথা দেয় আমায়।

❑ আপনার আমলে কলকাতা পুরসভার সাফল্যের খতিয়ান চাইলে হয়তো সুদীর্ঘ কোনও তালিকা আপনি আমাদের পাঠকদের সামনে উপস্থিত করবেন, কিন্তু বিশেষ কোনও একটা সাফল্যের কথা উল্লেখ করতে চাইবেন?

● পানীয় জলের কথা বলতে পারি। আমি নিউ পলতা করেছি। বৃটিশ আমলের পর নতুন করে আর একটা পলতা গড়ার নজির আমার ছাড়া আর কারুর নেই। তার ক্যাপাসিটিও বাড়িয়েছি। কলকাতার এমন কোনও অংশ নেই, যেখানে আমি রিজার্ভার করিনি। কসবা কিংবা বড়বাজারের লোকেরা

"দু'টো জিনিস। এক, প্রশাসনকে পার্টির প্রশাসন করে তোলা। সেখানে দুর্নীতি চরমে উঠেছে, দালালরাজও তুঙ্গে, টাকা ছাড়া এখানে কোনও কাজ হবে না। দ্বিতীয়ত, পরিষেবাটা হঠাৎ একেবারে বসে পড়েছে।"

কোনওদিন ভেবেছিল জল পাবে! তারা এখন সরাসরি জল পাচ্ছে। বাগমারীতে গুচ্ছের রেললাইন পেরিয়ে জল আনতে গেলে লোকে মারা যেত রেলে কাটা পড়ে। সেখানেও রিজার্ভার হয়েছে। এখানে গরফা, রাণীকুঠি, কালীঘাট—এমনভাবে ওয়ার্ডভিত্তিক জলসাপ্লাই-এর যে নেট-টা সাজিয়েছি তা যদি ঠিক-ঠাকভাবে ব্যবহার করা যায় তবে আগামী পঁচিশ বছর কলকাতায় জলের অভাব হবে না। আমার পরবর্তী লক্ষ্য ছিল জলের কোয়ালিটি-টা বাড়াবার। কিন্তু এটা করে উঠতে পারিনি, কারণ পাঁচ বছরে ওটা হয় না। আমি জলের কোয়ান্টিটি বাড়াতে পারলেও কোয়ালিটি বাড়াতে পারিনি। এরা রাজনীতি করে জলের কোয়ান্টিটিরও বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। এখন তো সাপ্লাইও কম।

❑ রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে আপনার আমলে কলকাতা পুরসভার ভূমিকাটা ঠিক কি ছিল?

● আমি চূড়ান্ত অব্যবস্থার মধ্যে ৩৫০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে দায়িত্ব নিয়েছিলাম। তখন ফাইনান্সের বীভৎস অবস্থা। তেরো বছর কোনও হিসেবই দেয়নি এরা। কোনও ভাউচার নেই। এগুলো ধরা পড়ল যখন এশিয়ান ডেভেলপমেন্টের কাছে টাকা চাইতে গেলাম, ক্যাগের রিপোর্ট ইত্যাদি বার করলাম; তখন দেখলাম ইটস্ আ হরার। পেমেন্টের ভাউচার পর্যন্ত নেই। ৬৭টি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট, সবকটা থেকে ওভার ড্রাফট নেবার জন্য। আমি এটাকেই কমিয়ে ১০টাতে নিয়ে এসেছিলাম। আমি যখন চলে আসি তখন ৬৫০ কোটি টাকার রাজস্ব উদ্বৃত্ত (সারপ্লাস রেভিনিউ) হয়েছিল।

❑ কিন্তু বিকাশবাবু আপনার বক্তব্যকে আদপেই মানছেন না। তিনি পুরো ব্যাপারটাকেই ভাঁওতা বলছেন। যেহেতু অন্তিম বাজেটে আপনি ১১৩-১৪ কোটি টাকার ঘাটতি দেখিয়েছিলেন।

● শোন, বাজেটে ঘাটতি হলো একটা অর্থনৈতিক কৌশল। ভারতবর্ষ-ই শুধু নয়, পৃথিবীর যেখানেই সংসদীয় গণতন্ত্র রয়েছে সেখানে সব অর্থমন্ত্রীরাই তাঁদের বাজেটে একটা ছোট্ট ঘাটতি রাখেন। এর কারণ ঘাটতিটা থাকলে সেই ঘাটতিটা পূরণ করার জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করার একটা প্রবণতা জন্মায়। আমি পরিকল্পনা মাফিকই ওই ঘাটতিটা রেখেছিলাম। সাম্প্রতিক প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কেন্দ্রীয় বাজেট কিংবা অসীম দাশগুপ্তের রাজ্যবাজেট দু'- জায়গাতেই কিন্তু তুমি স্রেফ এই কারণেই বাজেট-ঘাটতিটা

(এরপর ১৩ পাতায়)

চিঠিপত্র

রেলমন্ত্রীর অভিনন্দন

গত ১৩ এপ্রিল ২০১০ ফুরফুরা শরীফ থেকে ডানকুনি পর্যন্ত নতুন লাইনের নির্মাণ কার্যের শিলান্যাস করলেন মাননীয়া রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ফুরফুরা শরীফ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা বলে মাননীয়া রেলমন্ত্রীর একপেশে অভিনন্দন জানানো যথা, মুসলিম নারীদের নামাজ পড়ার স্টাইলে মাথায় কাপড় জড়িয়ে দোয়া মাঙার ভঙ্গিমায় মুসলিম ভোটারদের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেওয়ার ছবি দেখে মনে হতেই পারে উনি বোধহয় ভারতের মুসলিমদেরই রেলমন্ত্রী। 'কারণ এর পূর্বেও দেখা গেছে ওনাকে ইদের দিন ইফতার করতে নমাজ পড়ার ভঙ্গিমায় দোয়া মাঙতে। অথচ বিজয়া সম্মিলনী করতে বা কোথাও উৎসবের ব্যক্তিদের নিয়ে মাতামাতি করতে দেখা যায়নি। গীতা পাঠ করতেও দেখা যায়নি। এতবড় ভারতবর্ষের মধ্যে এবার তো বহু ট্রেন নতুন সংযোজন করলেন, যেসব ট্রেন ভারতের বিভিন্ন জাতির রাজ্যের মধ্যে দিয়ে গেছে কিংবা তাদের রাজ্য অবধি গেছে। কই তার পূর্বে তো ওনাকে ঘটা করে শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, যারা সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে মুসলিমদের থেকেও সংখ্যালঘু, তাদের উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মীয় আচরণের সামিল হতে দেখা যায়নি। অবশ্য কথায় আছে 'ভেক্ না ধরলে ভিক্ষা মেলে না'। তথাপি বলা যেতে পারে ভেক কি শুধু সাম্প্রদায়িক মুসলিমদের জন্যই ধরতে হবে? বাকি জাতের সত্যকারের সংখ্যালঘু যারা তাদের জন্য ধরার কোনও অভিলাষ নেই। নাকি শুধুমাত্র মুসলিম ভোটারগণই তাকে ভোট দেন আর বাকীরা দেন না। দিন দিন সংখ্যালঘু তোষণের যা আদিখ্যেতা করে চলেছেন, সংখ্যাগুরুরা তো মনে করতেই পারে তারা পাকিস্তানে বাস করছে। চাকুরির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ, পড়াশুনার ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ; গোদের উপর বিষফোঁড়ার ন্যায় মহিলা মুসলিমদের জন্য আবার আলাদা করে সংরক্ষণ। এরপর আছে ও বি সি, এস সি, এস টি সংরক্ষণ। তাহলে উচ্চবর্ণের ছাত্রছাত্রীরা কি পড়াশুনা চাকুরি পাবার জন্য মেধার প্রকাশ ঘটিয়েও ব্রাত্য থাকবে? এই তো সিঙ্গুরে যখন অবস্থান করছিলেন টাটাদের বিরুদ্ধে তখন বাঁধা মঞ্চে র উপরে বসে ওনাকে নমাজ পড়ার ভূমিকায় দেখা গেছে। ঐগুলি ঢং নয়? কই আজ অবধি কোনও ছবি দেখতে পাওয়া যায় না তো যে উনি গীতা পাঠ করছেন? অথবা বাইবেল পড়ছেন, গ্রন্থসাহেব কিংবা ত্রিপিটক পাঠ করছেন? অথবা পাওয়া যায় না কেন কোনও সংবাদপত্রে? হিন্দু, খৃস্টান, পাঞ্জাবী, বৌদ্ধরা কি মমতাকে ভোট দেন না? মমতার বিচারে জৈনরা বা জরথুষ্ট্রবাদীরা কি অপাংক্তেয়?

তাই বলি, এর আগে কোনও সরকার বা রাজনৈতিক দল আপনার মতো সংখ্যালঘুদের মাথায় তুলে ভারতে পুনরায় মুঘল সাম্রাজ্য গড়বার দিকে এক ইঞ্চি করে এগিয়ে দেয়নি। সংবাদপত্রের প্রত্যহ সংবাদে যেভাবে দেখা যাচ্ছে তাতে করে আপনার দিকেই এরা ব্যুমেরাং হয়ে যে ফিরে আসবে একথা বলাই বাহুল্য। সাবধান থাকাই বুদ্ধি মত্তার কাজ।

—দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

প্রতারণার বনধ্

গত ২৭ এপ্রিল মূল্যবৃদ্ধির ইস্যুকে সামনে রেখে আর একবার বন্ধ পালন করল সিপিএম তথা বামফ্রন্ট। সারা ভারতে শিল্প ধর্মঘটের নামে রাজ্যে এই বন্ধ কার্যত জনবিরোধী নীতির পরিচয় বর্ধন করে। বাঙালীর উৎসবের মতোই যেন বছরে একবার বন্ধ ডাকা বামফ্রন্টের কাছে নিয়মমাফিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাম জমানায় বন্ধ যেন অপরিহার্য একটা বিষয়। প্রতিবাদের শেষ পদক্ষেপই হলো বন্ধ। যেন বন্ধের কর্মসূচীর ফলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু বন্ধের ফলে কি সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব? সমাজ জীবনে বন্ধ কি চরম বিপর্যয় ডেকে আনে না? কর্মনাশা দিন হিসেবে বন্ধ কি রাজ্যে আর্থিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না? জনজীবনকে স্বাভাবিক রাখা, রাজ্যের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখাই রাজ্য সরকারের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেই সরকার পক্ষই যদি বন্ধের সমর্থনে জনজীবনকে স্তব্ধ করে দেয়, রাজ্যের অগ্রগমনকে বিপথগামী করে সে রাজ্যের জনগণের সুখসমৃদ্ধি, সার্বভৌমত্ব কিভাবে বজায় থাকে? রাজ্যের ভবিষ্যতও ক্রমশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে থাকে তা বলা যায়। এমনিতেই দীর্ঘ বামরাজত্বে রাজ্যের হাল ক্রমশ নিম্নগামী। বন্ধের কর্মসূচীর ফলে এই করুণ অবস্থা আরও ত্বরান্বিত হতে বাধ্য। এই বন্ধ যদি জনগণের স্বার্থে হয় তবে কি বন্ধের সাফল্য জিনিসপত্রের মূল্যহ্রাসে সহায়তা করবে। ভুললে চলবে না আলুর লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি তে এই বাম সরকারের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও ব্যর্থ প্রয়াস রাজ্যবাসীর কাছে প্রতারণার সঙ্গেই তুলনীয়। অথচ এ মরশুমে আলুচাষীরা আলুর ন্যায্য মূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চি ত হলেও এই বাম সরকার কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। এ হেন ভূমিকায় মূল্যবৃদ্ধির ইস্যুতে বন্ধ ডাকার অর্থ রাজ্যবাসীর সঙ্গে আরও একবার প্রতারণা করা ছাড়া কিছু নয়। এ যেন রঙ্গমঞ্চে নিত্য নতুন অভিনয় করে চলেছে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট। ন্যায়, নীতি, সৌজন্যবোধের বদলে ছলে বলে কৌশলে জনগণকে প্রলুব্ধ করাই এখন তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রকে হত্যা করার সঙ্গেই যা তুলনীয়। কিন্তু রাজ্যের সজাগ ও সচেতন জনগণ বর্তমানে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর। জেনে রাখা ভালো সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলি।

স্বপনদা ও সঙ্ঘস্থান

গত ৮ মার্চ, ২০১০ সংখ্যার তেরো পৃষ্ঠায় 'সঙ্ঘকে দিতে হয়, সঙ্ঘ থেকে নিতে নেই' শিরোনামে অশোক ভক্তের লেখা পড়তে পড়তে সত্তর সালে মেদিনীপুর শহরে নূতনবাজারের পাহাড়পুর মাঠের সঙ্ঘস্থানের ছবি যেন আবার দেখতে পেলাম। তখন সঙ্ঘস্থানগুলি খুবই প্রাণবন্ত ছিল। সেই সময়ের দক্ষ শাখা সংগঠকরা ছিলেন। স্বপনদা ইংরেজীতে দক্ষ শিক্ষক ছিলেন। ওয়ার্ধায় কর্মজীবন শেষ করে মেদিনীপুরে ফিরে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় জানতে পারলাম ওনার স্কুলের খাতায় নাম ছিল প্রভাস সরকার। শারীরিক কার্যক্রম, ভাষণ, সঙ্গীত, ঘোষ—শাখার নানা কার্যক্রমে উনি সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ প্রচারক জীবনে কখনও টাকার অভাবে না খেয়েও কেটেছে বলে শুনেছি।

কিন্তু সত্তরের দশকের সেই প্রভাবী শাখা মেদিনীপুর শহরে ১৯৭৫ সালের নিষেধাজ্ঞার পর আজও গড়ে উঠতে পারেনি। তাঁতিবেড়িয়ার টাউন কলোনীর বাড়ীতে থেকে অসুস্থতার মধ্যেও শরৎপল্লীতে ভাই-এর বাড়ীতে অসুস্থ দিদিকে প্রায়ই দেখতে যেতেন। একাই বাড়ীর দোতলায় থাকতেন। উনি কিন্তু যতদূর সম্ভব নিজের কাজ নিজেই করতেন। কারও সাহায্য নিতে চাইতেন না, সে কি ব্যক্তিগত, কি সংঘের থেকে। দেখা করতে গেলেই চা না খাইয়ে ছাড়তেন না। আজ ও আগামী দিনে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে কাজ করে সংগঠন গড়ে তোলায় নিবেদিত প্রাণ স্বয়ংসেবকদের কাছে প্রয়াত স্বপনদার স্মৃতি সতত প্রেরণাদায়ক হবে, এতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

—ভোলানাথ নন্দী, মানিকপুর, মেদিনীপুর।

ভারতের মুসলিম সমাজের পশ্চাদগামিতার কারণ

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

জনমত

১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পর ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু মুসলমান শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই ভারতের মুসলমানদের মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবং ঘৃণা জন্মেছিল। তারা ইংরেজদের ঠিক সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু কিছু করার ছিল না। মুসলমানরা ইংরেজদের সংশ্রব ত্যাগ করে নিজেদের ক্রমশ গুটিয়ে নিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে মধ্যযুগীয় আরবীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আত্মনিয়োগ করেছিল। সম্মান, সম্পদ, আত্মমর্যাদা হারিয়ে দারিদ্র্যের কারণ ঘটিয়েছিল। অন্যদিকে তৎকালীন হিন্দু সমাজ লক্ষ্য করল ইংরেজ শাসকরা হিন্দু মন্দির ভাঙ্গছিল না, হিন্দু রমণীরা শাসকদের লালসার শিকার হচ্ছিল না, যখন তখন অপহৃতা হচ্ছিল না, জোর করে হিন্দুদের ধর্মান্তর করছিল না। বরং সারাদেশে একটা সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উন্নতমানের রাস্তাঘাট, যানবাহন, রেলওয়ে, ডাক-তার পরিষেবা চালু হয়েছিল। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মেডিক্যাল কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছিল। তাই হিন্দুরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। ফলে ইংরেজদের বিশ্বস্ত হতে পেরেছিল এবং প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেছিল। বড় ডাক্তার, ল-ইয়ার, শিক্ষাবিদ হিন্দুরাই হতে পেরেছিল আর মুসলিম সমাজ ক্রমশ দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হচ্ছিল। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটল, নবজাগরণ ঘটল তখন ইংরেজ শাসক বিপদ উপলব্ধি করে মুসলমানদের "তোল্লা" দিতে শুরু করেছিল। মুসলিম সমাজের বেশ কিছুটা উন্নতি ঘটেছিল।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাকিস্তান গঠিত হলে মুসলিম সমাজের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই পাকিস্তানে গিয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করেছিল। শুধুমাত্র অনুন্নত বা দরিদ্র মুসলমান, যাদের পাকিস্তানে যাওয়ার মতো সঙ্গতি ছিল না তারাই ভারতে থেকে গিয়েছিল। তখন তাদের সংখ্যা ছিল ৩.৫ কোটির মত। অর্থাৎ প্রথম থেকেই স্বাধীন ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের ৯০ শতাংশই ছিল অনুন্নত এবং দরিদ্র। এরা পরিচালিত হয়, মুসলিম সমাজের মওলানা, মওলভী, ইমামদের দ্বারা। তাদেরই নির্দেশে নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজ চাকরি ভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা পরিহার করে সন্তান সন্ততিদের মাদ্রাসা মক্তবে পাঠায় মধ্যযুগীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে। মাদ্রাসা, মক্তবে কি শেখে ছাত্ররা? আরবি ফারসি ভাষার কিছুটা আর কুরআন শরিফ এবং হাদিসের কিছু আয়াত। এতে আর যাই হোক চাকরির প্রতিযোগিতায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সফল হওয়া যায় না। তাই সরকারি বা বেসরকারি চাকরিতে মুসলমানদের সংখ্যা ২ শতাংশ বলা হয়ে থাকে। অবশ্য চাকরি পাক বা না পাক নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজের কিশোর তরুণ বা যুবকেরা কেউ বেকার থাকে না। কারণ কিছু ব্যবসা মুসলমানদের একচেটিয়া যেমন, মাংসের দোকান, লেপ তোষক তৈরি, টেলারিং, ফলের ব্যবসা, গাড়ী মেরামতি, গাড়ীর টায়ার ভল্কানাইজিং প্রভৃতি। তাই মাদ্রাসার পাঠ শেষ করে অধিকাংশই পিতার ব্যবসাতে যোগ দেয়। কশাই-এর ছেলে জবাই করতে শেখে, ধুনুরির ছেলে লেপ তোষক তৈরি করতে শেখে, দর্জির ছেলে জামা-প্যান্ট তৈরি করতে শেখে, মেকানিক্স-এর ছেলে গাড়ী মেরামতি শেখে, রাজমিস্ত্রীর ছেলে রাজমিস্ত্রীর কাজ শেখে। অনেকে ঠেলাগাড়ী বা ভ্যান রিক্সায় সব্জী বা জামা-প্যান্ট নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বিক্রী করে। কাজেই একজন মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতক হিন্দু যখন চাকরির চেষ্টায় জুতোর সুখতলা ক্ষয় করে ফেলে তখন মাদ্রাসায় পড়া একজন মুসলমান যুবক রীতিমতো রোজগার করতে থাকে। মনে রাখা দরকার পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ এবং এদের ৯০ শতাংশই হিন্দু। অথচ, রাজনীতির ব্যাপারীরা সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে মুসলমানরা সুযোগ পায় না এই অজুহাতে কেঁদে, কঁকিয়ে একশা হন। মুসলমানদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণের দাবী করেন। এদের সঙ্গে যোগ দেন মুসলিম বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতির ব্যাপারীরা। যেমন বামফ্রন্টের এক মন্ত্রী, রেজ্জাক মোল্লা দাবী করেছেন শতাংশ-টতাংশ নয়, মুসলিমদের সবাইকেই সংরক্ষণের আওতায় আনতে হবে। মামার বাড়ীর আবদার আর কাকে বলা যেতে পারে? সংরক্ষণের দাবী যদি মেনে নিতেই হয় তাহলে সংরক্ষণ হওয়া উচিৎ দ্রারিদ্র্যের ভিত্তিতে। তা নাহলে সংরক্ষণের সুবিধে ভোগ করবে সমাজের উঁচু তলার লোকজন অর্থাৎ ট্রক্তজন্দ্রপ্পন্ত ন্ত্রক্তন্দ্বক্ত-এর পোষ্যগণ। দরিদ্র মুসলিম সমাজের কোনও উপকারই হবে না সংরক্ষণের ফলে। সিডুল্ড কাস্ট বা সিডুল্ড ট্রাইবদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এতে কতটা উপকৃত হচ্ছেন ওই জঙ্গলমহল লালগড় প্রভৃতি এলাকার না খেতে পাওয়া লোকজন, তপশিলি জাতি বা উপজাতি ভুক্তরা? বিন্দুমাত্র না। মুসলিম সমাজের জন্যও সংরক্ষণ-এর ব্যবস্থা চালু হলে ওই সমাজের যারা উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত, তাদেরই 'ভোগে' লেগে যাবে সংরক্ষণের সুবিধেটুকু। আর দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত যারা, তারা যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। ন্যূনতম যোগ্যতা যাদের নেই তারা সংরক্ষণের কোন সুযোগ নিতে পারে? সুতরাং সংরক্ষণ হওয়া উচিৎ দারিদ্র্যের ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। তবে এখানেও একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে। এক মিঞা সাহেবের যদি ৩/৪টি বিবি থাকে আর সন্তান সংখ্যা ১২ বা ১৪ তাহলে, তার দারিদ্র্য কেউ দূর করতে পারবে না। এক হিন্দু দম্পতি এক বা দুই সন্তান নিয়ে স্বচ্ছল অবস্থায় থাকে তখন একই আয়সম্পন্ন কোনও মিঞা সাহেব ১২-১৪টি ছেলেমেয়ে এবং ৩-৪টি বিবি নিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে বাধ্য। এখানে মিঞা সাহেবের দারিদ্র্যের কারণ সে নিজে। কাজেই একে সংরক্ষণের সুবিধে দারিদ্র্যের কারণে কিছুতেই দেওয়া যেতে পারে না। তাছাড়া সংরক্ষণের সুবিধে নিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চি ত করে কিছু অযোগ্য প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়া হবে, ফলে তৈরি হবে নিম্নমানের ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষাবিদ এবং চাকুরে। এটা কোনওভাবেই কাম্য নয়।

বিপ্লবী শঙ্করাচার্য

ডঃ সর্বানী চক্রবর্তী

শিরোনামটা দেখে পাঠকের একটু অবাক লাগতে পারে। কারণ, শঙ্করাচার্যকে আমরা ব্রহ্মবাদী, অদ্বৈতবাদী হিসাবেই জানি। ‘বিপ্লবী’? সেই যুগেও যে একজন অধ্যাত্মরাজ্যে বিপ্লবের আবির্ভাব ঘটাতে পারে তাঁরই কথা এখানে আলোচ্য বিষয়। সাধারণভাবে বিপ্লব বলতে বোঝায় শুধু পরিবর্তন নয়, যা আছে তার উত্তরণ। এখন তাঁর বৈপ্লবিক জীবন নিয়ে একটু আলোকপাত করা যাক।

৬৮৬ খৃঃ (মতান্তরে ৭৮৮ খৃঃ) কেরলের কালাডি নামক গ্রামে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে তাঁর জন্ম। ভাবলে অবাক হতে হয় কোনও রাজবংশে তাঁর জন্ম হয়নি; জন্মেছিলেন কেরলের বর্তমান রাজধানী তিরুবনন্তপুরম থেকে বহু দূরে, কোচি শহর থেকেও ৪০ কি.মি. দূরে, কালাডি গ্রামে। আলোয়াই নদীর উত্তর তীরে একটি বিশেষত্বহীন গ্রামে। তাঁর পিতা মনীষী বিদ্যাধর (মতান্তরে শিবগুরু) ও মাতা বিশিষ্টা দেবী।

একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, জ্ঞানী, পণ্ডিত শঙ্করাচার্যকে আমরা অদ্বৈতবাদের প্রথম প্রবক্তা হিসাবেই জানি। তিনি একজন শিবাবতার। তাঁকে বলা হয় ‘শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ’। দেবাদিদেব মহেশ্বরই আচার্য শঙ্করাচার্যরূপে ধরাধামে আবির্ভূত। প্রকৃতপক্ষে এই শঙ্করাচার্য কোনও পৌরাণিক চরিত্র নন, মহাকবির কল্পনার সৃষ্টিও নন। তিনি আমাদের ঘরের আর পাঁচটা ছেলের মতো জগতের জল-হাওয়ায় মানুষ হয়েছেন, শৈশবেই তাঁর মনে বৈরাগ্যের বাঁধন ছেঁড়ার ডাক তিনি শুনেছেন। এই ছোট্ট বালক ৮ বছর বয়সে জাতির ইতিহাসে এক বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

এক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণযোগ্য— পিতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান শঙ্কর, তাঁর কোনও ভাইবোন ছিল না। মাত্র তিন বছর বয়সে শঙ্করাচার্য পিতৃহারা হন। তখন তাঁর মা নিয়ম মেনে বাপের বাড়িতে এসে পুত্রকে গুরুগৃহে পাঠিয়েছেন। সেখানে ওই অল্প বয়সেই সব শাস্ত্র তিনি পড়ে ফেলেছিলেন। শুধু তাই নয় নিজের বাড়িতে টোল খুলে রীতিমত অধ্যাপনা ও শাস্ত্রচর্চা করতেন। ক্রমে বালক শঙ্করের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেই সময়ে কেরলের রাজা রাজশেখর নিজে এসে বালকের পাণ্ডিত্য, বিচারনিপুণতা, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সর্বোপরি সুমধুর বাচনভঙ্গী শুনে খুশি হয়ে বালকের পায়ের কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা রাখলেন। ছোট্ট বালক রাজার বদান্যতায় খুশি হয়ে বললেন—“আপনি দেশের রাজা, আমি ব্রাহ্মণ বালক, আমার চেয়ে অর্থ কাকে দিতে হবে তা আপনিই বেশি জানেন। বিদ্যাদান আমার কাজ, অর্থদান আপনার কাজ।”

পরাজিত রাজা কিন্তু ফিরে গেলেন মনে আনন্দ নিয়ে। মনে মনে ভাবলেন এমন মানুষও হয়। গরীব কিন্তু নির্লোভ, দিতে জানে, নিতে জানে না। বালকের কথাগুলি মনে মনে স্মরণ করে রাজার মন আনন্দে ভরে ওঠে—“রাজা! আমি ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী। আমার অর্থের দরকার নেই। জননী আর আমি সুখেই বাস করি। কিছুই অভাব নেই। কিন্তু বালক শঙ্করের খ্যাতি যত বৃদ্ধি পেতে লাগল তত অনেকের মনে ক্রোধ ও হিংসা বৃদ্ধি পেল। কালাডি গ্রামের ব্রাহ্মণরা তখন কি করে জব্দ করবে বালককে তারই সুযোগে থাকেন। তাঁদের জ্বালা বাড়ে বইকি!

একদিন চার জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ—দধীচি, ত্রিতল, গৌতম, অগস্ত্য এসে বালকের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে কোষ্ঠী বিচার করে বললেন—এ বালক হবে অসাধারণ কিন্তু স্বল্পায়ু। সে বিরাট হবে, কিন্তু ঘরে থাকবে না, বাঁচবেও না বেশিদিন। এ ঘটনায় মাতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠল।

শঙ্কর জানেন যে মাতৃআজ্ঞা ভিন্ন সন্ন্যাস নেওয়া হবে না। তাই গ্রামের আলোয়াই নদীতে একবার স্নান করার জন্য নেমেছেন তখনই একটি কুমীর তাঁর পায়ে কামড়েছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়। তখন শঙ্করাচার্য একবার জননীর দিকে তাকিয়ে বললেন—“মা, তুমি আমাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিলে তবেই আমি মুক্তি পাবো।” জননী আর কি করেন, নিরুপায় হয়ে প্রাণপ্রিয় পুত্রের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়েই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। পরে চোখ মেলে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে দেখে উঠে বসেন। কিন্তু নদী থেকে যিনি নতুন জীবন পেয়ে উঠে এলেন তিনি হলেন সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য। মাকে কথা দিলেন পৃথিবীর যে প্রান্তেই তিনি থাকুন না কেন মায়ের অন্তিমকালে উপস্থিত হবেনই। অথচ একসময়ে মা নিত্য গঙ্গাস্নানে অপারগ বলে সুযোগ্য পুত্র গঙ্গাকে আহ্বান করে আনলেন তাঁদেরই বাড়ির কাছে। তার নাম হল চূর্ণী নদী।

এই যে শৈশবের ঘটনা একটা বৈপ্লবিক উপাদানে গড়া। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিশাল প্রতিভা, প্রভূত যশ বা খ্যাতি কোনও কিছুই তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। শান্ত প্রকৃতি, স্নিগ্ধ মেজাজ, কবিজনোচিত রসবোধ, কিন্তু জনবিদ্রোহী, লড়াইয়ের জন্য সদা প্রস্তুত। তাই মাত্র আট বছরের এক ছোট্ট বালক নিজের ঘর ছেড়ে অজানা, অচেনা পথে একাকী পাড়ি দিয়েছিলেন। মায়ের মৃত্যুর আগে আর তিনি বাড়ি ফেরেননি। মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করে আবার তিনি উধাও হয়ে যান। অবশ্য তিনি তখন আর অচেনা মানুষ নন, তখন তাঁর ভারতজোড়া খ্যাতি।

‘কঠোপনিষদে’ নচিকেতা যেমন পিতৃসত্য পালনার্থে যমালয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক সেরূপ অষ্টম বর্ষীয় সন্ন্যাসী বালক, শঙ্করাচার্যও সুদূর কেরল থেকে নর্মদার মধ্যবর্তী ওঙ্কারেশ্বরের গহন গুহাভিমুখে দু-মাস ধরে যাত্রা করেছিলেন। কারণ তিনি পাঠকালে জেনেছিলেন মহর্ষি পতঞ্জলি সহস্র বৎসর ধরে গুহামধ্যে সমাধিস্থ। গোবিন্দপাদ তাঁর বর্তমান নাম। তিনি গৌড়পাদের শিষ্য।

শঙ্করাচার্য গুহায় প্রবেশ করে দেখলেন এক অপূর্ব দৃশ্য—টানা টানা মুদ্রিত চোখ, দীর্ঘনাসিকা, প্রশস্ত ললাট, উন্নত দেহ, কিন্তু শরীরের চামড়া ঝুলে পড়েছে। সুযোগ্য শিষ্য এতদিন তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি তখন হাতজোড় করে অপূর্ব সুললিত কণ্ঠে শ্লোকে গুরুবন্দনা করলেন। গুহার ভেতরটি তাঁর আকুতিভরা কণ্ঠের ধ্বনিতে ভরে গেল। অপূর্ব শ্লোকের আকর্ষণে গুহার বাইরের সন্ন্যাসীরা একে একে এসে জড়ো হলেন। গোবিন্দপাদের হৃদয়ে স্পন্দন জেগে উঠে, দেখলেন তাঁর শিষ্যকে, তিনি জড়িয়ে ধরলেন। গোবিন্দপাদ এক এক বছরে শঙ্করকে হঠযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের উপদেশ দিলেন। মাত্র তিন বছরেই শঙ্করের যোগসাধনা সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

আচার্য শঙ্করের সম্বন্ধে একটি অলৌকিক গল্প আছে—একসময়ে গুহার মধ্যে যখন গোবিন্দপাদ যোগে লীন ছিলেন তখন নর্মদার জল শতধারায় প্রবাহিত হয়ে ওই গুহায় প্রবেশ করলে শঙ্করাচার্য একটি কলসীর মধ্যে শতধারাকে আটকে

।। ভগবান আদি শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত।।

রেখেছিলেন। যাতে গুরুদেবের তপস্যায় বিঘ্ন না ঘটে। তাই মহামুনি ব্যাসদেব যখন ধর্মের নামে নানা অপব্যাখ্যা শুনে দেবাদিদেবের কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন তখন শিব

পরম্পরা

তাঁকে বলেন—“যে ব্যক্তি হাজারধারা নদীস্রোত একটিমাত্র কলসিতে ভরতে পারবে, জানবে, সেই বহু মতের ধারাকে একটি উচ্চতম সার্বভৌম মতের মধ্যে আশ্রয় দেবে।” তখন দেবতারা স্তব করে ব্যাসদেব বলেন—“মহাদেব, একাজ আপনিই করুন। অন্য কেউ পারবে না।” শিব তাতে রাজি হয়েছিলেন।

হয়তো এটি নিছক গল্প বলে শ্রোতার মনে হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে সত্যের ইঙ্গিত আছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় যতই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি জানাক, বিশ্বের ভারতীয় দর্শন বলতে সর্বাগ্রে শঙ্করের বেদান্ত দর্শনের কথাই উঠে আসে। সব ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে শংকরের স্থান সর্বোচ্চ। এমনকী বলা যেতে পারে, পরবর্তীকালে তাঁর মত খণ্ডন না করে কোনও আচার্য, কোনও সম্প্রদায় নিজেদের বিশিষ্ট মত স্থাপন করতে পারেননি। রামানুজ, মধবাচার্য, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ প্রাচীন মহাজনরাই শুধু নন, এ যুগের শ্রী অরবিন্দকেও ওই একই কাজ করতে হয়েছে।

মধ্যযুগে শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণব গোস্বামীরা যে অভিনব গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন উদ্ভাবন ও প্রচার করেছিলেন তাঁর মূলেও ছিল এই ‘বেদান্ত’। নব যুগের সম্রাট সন্ন্যাসী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্যের বেদান্তকেই জগতে প্রচার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ সাধনাও ছিল বৈদান্তিক গুরু নির্দেশিত অদ্বৈত সাধনা। তাঁর সাধনধারা চূড়ান্ত শীর্ষে পৌঁছেছিল নির্বিকল্প সমাধিতে অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে। আসলে উদার অদ্বৈতবোধই সব আধ্যাত্মিক সাধনার শীর্ষভূমি। মূলত শঙ্করাচার্য উত্তরাধিকারে সূত্রে যা পেয়েছিলেন, নিজের তপস্যালব্ধ উপলব্ধিতে তা জীবন্ত করে তুলেছিলেন।

গোবিন্দপাদ বলেছিলেন, তিনি ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রের অর্থ জেনেছেন স্বয়ং ব্যাসদেবের মুখ থেকেই। তবে গোবিন্দপাদের গুরুদেব গৌড়পাদের লেখা—‘গৌড়পাদকারিকা’ নামে পরিচিত ছোট আকারের একটি গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের মূল সূত্রগুলি পাওয়া যায়। আনন্দের বিষয় ওই গ্রন্থটি বর্তমানে মুদ্রিত হয়েছে।

গৌড়পাদের নামটির মধ্যে একটা বাঙালিসুলভ গন্ধ পাওয়া যায়। বৃহত্তর বাংলার অন্তর্গত মিথিলা তথা ভারতের এই পূর্বাঞ্চল ছিল বেদান্তের জন্মভূমি। মিথিলার রাজা জনকের কাছে সেযুগের ব্রাহ্মণ ও ঋষিরাও বেদান্ত তত্ত্ব জানতে আসতেন। মিথিলার কাছেই ছিল প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়; যার প্রধান পুরোহিত ছিলেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। এই রাজা জনকের রাজসভাতেই ঘোষিত হয়েছিল ব্রহ্মবাদের কথা। ‘বৃহদারণ্যক উপনিষদে’ এর প্রমাণ মেলে। মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ শুনে বিমুগ্ধ জনক সিংহাসন থেকে নেমে এসে প্রণাম করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ‘এহো বাহ্য’! এই রাজসভাতেই ব্রহ্মবিদূষী গার্গী সমবেত জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—“ব্রহ্মবিচারে এঁকে পরাস্ত করতে আপনারা পারবেন না।” এটাই যাজ্ঞবল্ক্য সম্পর্কে ছিল শেষ কথা। অপরাজেয় ছিলেন ঋষি।

এই ধারাকেই বহন করেছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান শঙ্করাচার্য। কথিত আছে, বাংলায় এসে তিনি তাঁর পরম গুরু গৌড়পাদের দর্শনও পেয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মপ্লাবিত বাংলায় এসে শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের প্রতিহত করেন, তার্কিকদের সঙ্গে তর্ক করে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তখন গঙ্গাতীরে তাঁর একদিন অপূর্ব দর্শন হয়। তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং গৌড়পাদ। শঙ্করাচার্যকে আশীর্বাদ করে তিনি বললেন—“তুমি বর নাও।” তদুত্তরে উপযুক্ত শিষ্য বললেন—“...আমার চিত্ত যেন সর্বক্ষণ ব্রহ্মপদে লীন থাকে।” এই প্রার্থনার নিহিত অর্থ হলো, জগৎ ব্যাপারে শঙ্করাচার্য আর লিপ্ত থাকবেন না—এটা তারই ইঙ্গিতবাহক। তাঁর ২২টি ভাষ্যগ্রন্থ, ৫৪টি উপদেশ ও প্রকরণগ্রন্থ এবং ৭৫টি স্তোত্রে একটাই চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়—তা হলো আমি শূন্যও নই, অশূন্যও নই, আমি অদ্বৈত। আমি অনির্বচনীয়। এই যে সর্ববন্ধনমুক্ত একটা অবস্থা, তা তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই অবস্থার দিকে যত আমরা অগ্রসর হব তত আমরা ইগোমুক্ত ছদ্রহ্মসঙ্গ, স্বার্থমুক্ত, মালিন্যমুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ চেতনা লাভ করবো। এতে ব্যক্তি তথা সমাজ ও বিশ্বেরই কল্যাণ হবে। এককথায় বলা যায় একটা নিঃস্বার্থ আত্মদানের জন্ম হবে।

রাজনৈতিক বিপ্লবগুলি এজন্য মনে হয় রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ে শেষ হয়। সমাজে ন্যায়, সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। মানুষে মানুষে বাড়ে শোষণ, হিংসা, অত্যাচার, বঞ্চনা। বিপ্লবোত্তর সমাজে পুরানোই আবার ফেরে নতুন রূপে। যিনি নিজে মুক্ত নন, তিনি অন্যকে মুক্তি দিতে পারেন না। শঙ্করাচার্য কোনও রাজনৈতিক তক্‌মাআঁটা নেতা ছিলেন না। সাময়িক সমাজ সংস্কার বা অতি সাময়িক সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি নিয়েও তিনি কখনো জনসমক্ষে দাঁড়াননি। যিনি প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী হন, তিনি কখন সমকালের কথা ভাবেন না, তিনি ভাবেন বহুব্যাপ্ত কালের কথা। শ্রদ্ধেয় স্বামী চিন্ময়ানন্দ তাঁর ইংরাজি গ্রন্থে—“Bhja Govindam”—এ শঙ্করাচার্যকে ‘A powerful leader’ হিসাবে অভিহিত করেছেন।

(এরপর ১৫ পাতায়)

চাকরির প্রথম শর্ত আত্মবিশ্বাস

পেশা প্রবেশের প্রথম সোপান ইন্টারভিউ, যার একপ্রান্তে বসেন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কর্তারা আর অপরপ্রান্তে চাকরিপ্রার্থী। চোখের জরিপে, প্রশ্নের বাণে তাঁরা যাচাই করে নেন প্রার্থী কতটা মজবুত, স্মার্ট এবং গ্রহণযোগ্য। এমন পরিস্থিতিতে প্রার্থীর কাঙ্ক্ষিত ভাবমূর্তির ওপর টেনশন ও ভয় একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী একটা ইন্টারভিউর ভয় কাটিয়ে ওঠার উদ্ধারকর্তা হলো আত্মবিশ্বাস। যে কোনও পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে-এর জুড়ি নেই।

কেন আত্মবিশ্বাস?

প্রথমত, ইন্টারভিউ-এ প্রার্থীর মূল লক্ষ্য নিয়োগকারীকে দেখানো, নির্দিষ্ট কাজের জন্য সে-ই উপযুক্ত। নিয়োগকারীরাও একই জিনিস বুঝে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কথাবার্তায় যদি তাঁরা বুঝতে পারেন প্রার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের খামতি রয়েছে, তাহলে সেই মুহূর্তেই বাদ পড়ার সম্ভাবনা। কেননা, আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকলে কাজের চাপ সামলাতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, আত্মবিশ্বাস প্রার্থীর শারীরিক ভাষায়, কথা বলায় স্মার্টনেস হয়ে ফুটে উঠবে। মনে রাখতে হবে, প্রতিষ্ঠানে ঢোকার মুহূর্ত থেকে বেরিয়ে আসার আগে পর্যন্ত কেউ না কেউ নজর রেখে চলেছেন চাকরি প্রার্থীর ওপর। ইন্টারভিউ-এর ফলাফলের অনেকটাই নির্ভর করে তার ভাবমূর্তি বা ইম্প্রেশনের ওপর। প্রার্থীর নিয়োগ কর্তাদের সামনে দাঁড়ানো, বসা, হাত পায়ের নিয়ন্ত্রণ, কথা বলার স্টাইল সবই রেকর্ড হয়ে যায়। তৃতীয়ত, ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে পৌঁছে নার্ভাস হয়ে গেলে ভুলভাল করে বসারও সম্ভাবনা থাকে। তাই

নবাঙ্কুর
নবাঙ্কুর

ইন্টারভিউ-এ সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন ভয়কে জয় করা আর প্রয়োজন ওই আত্মবিশ্বাস।

আত্মবিশ্বাস বাড়াতে

ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছু আগে চাকরি-প্রার্থীর পৌঁছে যাওয়া উচিৎ। এর ফলে ওই প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সময় পাওয়া যাবে। রিসেপশনে বসে অপেক্ষা করতে করতে লক্ষ্য করা যায় প্রতিষ্ঠানে কী ধরনের কাজ হচ্ছে, কর্মীরা কী কথা বলছেন, টেলিফোনে কথা বলার কায়দাকানুন। চাইলে রিসেপ্‌শনিস্টের সঙ্গে ছোটখাটো কথা বলে জেনে নেওয়া যেতে পারে কিছু জরুরি তথ্যও। তারপর একটা ইতিবাচক মন নিয়ে ইন্টারভিউয়ের জন্য অপেক্ষা করা। টেনশন কাটাতে মনে করা যেতে পারে উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন প্রার্থী। 'অ্যাঙ্কার' করা যেতে পারে। অ্যাঙ্কারিং হলো নিজেকে কোনও একটা নির্দিষ্ট মানসিকতার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া। এবং সেই মানসিকতার সঙ্গে একাত্মবোধ করা। ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণরূপে মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে ফেলবে তখন আপন মনে বলতে হবে গুঙ্গ দ্রঙ্গঙ্ক দ্দ, এগিয়ে চল, গুঙ্গ দ্রঙ্গঙ্ক দ্ধড়দ্দ দ্দণ্ডঙ্গত্বতাতে ইতিবাচক অনুভূতি এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবেই।

যথাসময়ে রিসেপশনিস্ট বা সেক্রেটারিকে সুন্দর করে বলতে হবে, Hallo, Good morning...My name is...I have an interview at 11-00 a.m....

যখন জানানো হবে যে ভিতর থেকে ডাক পড়েছে, তাড়াহুড়োয় রিসেপশনিস্টকে ধন্যবাদ জানাতে ভুললে চলবে না।

ইন্টারভিউ দিতে ঢোকার মুখে সম্পূর্ণ তরতাজা, ইতিবাচক এবং আত্মবিশ্বাসী থাকা খুবই জরুরি।

(এরপর ১৪ পাতায়)

।। চিত্রকথা ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।। ১০

কাশীতে পরমবৈষ্ণব সনাতনকে মহাপ্রভু বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

পণ্ডিত প্রকাশানন্দজীর আমন্ত্রণে কাশীতে গিয়ে একটি নালার ধারে বসেছিলেন। মহাপ্রভুর অদ্ভুত তেজে তাঁর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার দূর হয়ে গেল।

একদিন এক গোপ বালকের কাছ থেকে দই চেয়ে নিয়ে যান। মহাপ্রভুর কৃপায় সেই বালক হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠে।

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর-এর সৌজন্যে। (চলবে)

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর ।।

বিদেশি কিন্তু জন্মেছেন ভারতে

ইংরেজি কথা সাহিত্যিক রুডইয়ার্ড কিপলিং, জর্জ অরওয়েল, ইংরেজ অভিনেত্রী জুলি ক্রিস্টি, গায়ক ক্লিফ রিচার্ড, ক্রিকেটার কলিন কাউড্রে, বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস—এঁদের মধ্যে একটি ক্ষেত্রে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এবং তা হলো, এঁরা সবাই ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন।

দেশের নাম সোমালিয়া

বছর কুড়ির মেয়েটিকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হলো। তার অপরাধ, সে ডিভোর্সি। পরন্তু অন্য পুরুষের সঙ্গে তার প্রেম এবং সে ওই প্রেমিকের মৃত শিশুর জন্ম দিয়েছে। প্রেমিকের বয়স ২৯, সে অবিবাহিত, অবিবাহিত হয়েও যৌন সম্পর্ক করেছে! কী অন্যায়! সুতরাং পুরুষটির সাজা জুটেছে ১০০ ঘা চাবুক। আর মেয়েটির দোষের কি শেষ আছে! তাই কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে, পাথর ছুঁড়ে তাকে মারা হয়েছে। সেদেশে এবছর যৌন অপরাধের দায়ে ৪ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে— বেশির ভাগই পাথর ছুঁড়ে। দেশের নাম সোমালিয়া।

নেহরুকে উপহার গব্বর সিং

সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল কে এফ রুস্তমজী তাঁর 'দ্য বৃটিশ দ্য ব্যান্ডিটস্ অ্যান্ড দ্য বর্ডারম্যান' শীর্ষক জীবনীগ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৫৯ সালের ১৪ নভেম্বর জওহরলাল নেহরুর ৭০ তম জন্মদিনটি খুব সাড়ম্বরে পালিত হয়েছিল। কিন্তু নেহরুর মুখ্য নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে দিল্লিতে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না জন্মদিনে কী তাঁকে উপহার দেবেন। ওই সময় জন্মদিনের ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ১৩ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের ত্রাস কুখ্যাত গব্বর সিং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে দলবল সহ মারা যায়। গব্বর সিং সম্পর্কে নেহরুও উদ্বিগ্ন ছিলেন। সুতরাং তার মৃত্যু সংবাদটাই দিলেন। গব্বর সিং ছিল এক নিষ্ঠুর ডাকাত। সে নিরীহ মানুষের নাক কেটে নিত। তার শপথ ছিল ১১৬ জনের নাক কাটার। পরবর্তীকালে এই গব্বর সিংকে নিয়েই তৈরি হয়েছিল 'শোলে' নামে একটি হিন্দি চলচ্চিত্র।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

গজা (একটা রান্নার বইয়ের পাতা খুলে) ঃ এই দেখ, একটা রেসিপির নাম শামিকাবাব। শামিকাবাব কী রে?

ভজা ঃ তা-ও জানিস না, স্বামীদের কেটে কেটে যে-কাবাব বানানো হয় তার নাম শামিকাবাব।

* * *

পর্যটকঃ গুহায় ভয়ের কিছু নেই তো?

গাইড ঃ না না, আগে ধেড়ে ইঁদুরের উৎপাত ছিল। এখন শুধু সাপ আছে, সব ইঁদুর সাপের পেটে।

* * *

সেল্‌সম্যান ঃ এই কম্পিউটারটা নিন স্যার, কাজ অর্ধেক কমে যাবে।

কোম্পানির ম্যানেজার ঃ তাহলে আমাকে দু'টো দিন।

* * *

সমু ঃ তোর যদি জলাতঙ্ক হয় তুই কী করবি?

সিমু ঃ প্রথমেই কাগজ কলম নিয়ে বসব।

সমু ঃ কেন?

সিমু ঃ কেন আবার, কাকে কাকে কামড়াব তার একটা লিস্ট করতে হবে না!

* * *

রোগী ঃ ডাক্তারবাবু, এই ওষুধে আমার গলার ব্যথা সেরে যাবে তো?

ডাক্তার ঃ নিশ্চয়!

রোগী ঃ গান গাইতে পারব?

ডাক্তার ঃ নিশ্চয়।

রোগী ঃ ভালই হবে তাহলে। কারণ, এর আগে গান তো কখনও গাইনি।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। রবীন্দ্রনাথ যে-দুটি স্কুলে পড়েছিলেন, সে-দুটি স্কুলের নাম কী?

২। রাতে আছে দিনে নেই/তামাম মুলুক দেখে তাই।—কী সেটা?

৩। আধুনিক পেন্টাথেলন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের কোন্ পাঁচটি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়?

৪। কোন্ বাদ্যযন্ত্রটি শার্লক হোম্‌স ভাল বাজাতেন—ভায়োলিন না মাউথ অর্গান?

৫। 'মহাভারত'-এ ভীম ও হিড়িম্বার পুত্রের নাম কী?

—নীলাদ্রি

উত্তরঃ

১। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও নর্মাল স্কুল
২। তারা
৩। শ্যুটিং, রানিং ফেন্সিং, রাইডিং ও সুইমিং
৪। ভায়োলিন
৫। ঘটোৎকচ

ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে কোচবিহারে

প্রাণপ্রতিম পাল ॥ আসন্ন পুরভোট নিয়ে রাজনৈতিক পরিবেশ বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কোচবিহার জেলায়। আগামী ৩০ মে কোচবিহার জেলার চারটি পুরসভায় ভোটগ্রহণ হবে। মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা ও তুফানগঞ্জ পুরসভা বামফ্রন্টের দখলে রয়েছে। পরপর তিনটি নির্বাচনে জয়ী হয়ে এককভাবে কোচবিহার পুরসভা দখলে রেখেছে কংগ্রেস। কোচবিহারের চারটি পুরসভার মোট আসন সংখ্যা ৫৯। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পুরভোটকে সামনে রেখে তাদের রণনীতি তৈরি করতে শুরু করেছে। বামফ্রন্ট তাদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে। কোচবিহার জেলার পুরভোটে সিপিএম ৩৬, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক ২০, সিপিআই-২, সমর্থিত নির্দল-১টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সম্পাদক উদয়ন গুহ বলেন, পুরো জেলাতেই সার্বিক বাম ঐক্য গড়ে পুরনির্বাচনে লড়াই হবে। সিপিএমের কোচবিহার জেলার নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া বলেন, চারটি পুরসভায় ক্ষমতায় আসবে বামফ্রন্ট। রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের সন্ত্রাসে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। কোচবিহার পুরসভায় গত ১৫ বছরে ব্যাপক দুর্নীতি করেছে কংগ্রেস। তিনবারের পুরপিতা বীরেন কুণ্ডুর বিরুদ্ধে প্রচুর অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে বামফ্রন্ট। পাশাপাশিভাবে বামফ্রন্ট পরিচালিত পুরসভাগুলির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে প্রচার করতে শুরু করেছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী রাজনৈতিক শিবির। পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি বিষয়কে ইস্যু করছে রাজনৈতিক দলগুলি। চারটি পুরসভা নির্বাচনে এককভাবে প্রার্থী দেবে বামফ্রন্টের অন্যতম শরিকদল আর এস পি। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকাসহ পুরভোটের নির্বাচনী কৌশল নিয়ে গত ২ এপ্রিল সিপিএম-এর জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আর এস পি যোগ দেয়নি। ওই বৈঠকে আর এস পি-র কোনও নেতা উপস্থিত না হওয়ায় বামফ্রন্টের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। কোচবিহার পুরসভার পুরপিতা তথা জেলা কংগ্রেস সভাপতি বীরেন কুণ্ডু বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তাদের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার করছে বিরোধীরা। এর আগেও বাম নেতারা অনেক মিথ্যা প্রচার করেছেন। তবুও কোচবিহারের মানুষ কংগ্রেসকেই ভোট দিয়েছেন।

সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীদের

হারাতে জেলার চারটি পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সাথে জোটে রাজি তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, যে কোনও রকম উপায়ে তারা সিপিএম ও ফরওয়ার্ড ব্লককে হারাতে চান। জোট গড়ার লক্ষ্যে বৈঠকও করেন তারা। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের সাথে আলোচনাও হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস নেতৃত্বের আশা, জোট হলে দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ পুরসভাগুলি কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসবে। ধ্বংস হবে বাম ঐক্য।

কোচবিহার জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক নিখিল রঞ্জন দে বলেন, চারটি পুরসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দেবে। সাংগঠনিক শক্তি যে সব ওয়ার্ডগুলিতে রয়েছে এবং যার এলাকায় যথেষ্ট সুনাম রয়েছে এমন কর্মীদের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে বাছাই করবে। তবে সমস্তই হবে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। তিনি বলেন, কোচবিহার পুরসভা কংগ্রেস পরিচালিত। শহরের নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। মশার উৎপাতে অতিষ্ঠ শহরবাসী। শহরের ১নং, ২নং, ৩নং ও ৭নং ওয়ার্ডে চারদিন ধরে পাম্প বিকল হয়ে পড়েছে। শহর জুড়েই পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে অন্তত ১২টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দেবে বিজেপি। বাকী পুরসভায় এককভাবে লড়বে তার দল। এবারের পুরভোটে ভীষণ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে দুটি ওয়ার্ডে। এই দুটি ওয়ার্ড হলো ২ এবং ১৯নং ওয়ার্ড। কোচবিহার ২নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস প্রার্থী উজ্জ্বল তর। বিজেপির নিখিল রঞ্জন দে এবং সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সঞ্জয় দত্ত। এই ওয়ার্ডে এর আগের পুরনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী নিখিল রঞ্জন দে মাত্র ১২ ভোটে হেরেছিলেন। ২০০৫ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের মীনা তর ৪৩৮, বিজেপির নিখিলবাবু ৪২৬ ভোট পেয়েছিলেন। এবার বিজেপি এক্সট্রা মাইলেজ নেওয়ার চেষ্টা করছে। মীনা তর-এর পুত্রকে এবার বিজেপির নিখিলবাবু শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ওই ওয়ার্ডে লড়াই হবে ত্রিমুখী।

কোচবিহার শহরের অন্যান্য ওয়ার্ডের মতো ১৯ নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, বিজেপির মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই হবে। বিজেপির পক্ষে ওই ওয়ার্ডে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন অপু দে। বিজেপিকে হারাতে ইতিমধ্যেই নানা রকম অপপ্রচার করতে ময়দানে নেমে পড়েছে বিরোধী শিবির।

মেয়র ঠিক করে পার্টি, জনগণ নয়

(৯ পাতার পর)

দেখতে পাবে। আমাকে ৩৫০ কোটি টাকা ঋণগ্রস্ত করে যাওয়া হয়েছিল, আমি সেখানে উদ্বৃত্ত ছ'শো কোটি টাকা তোমার ব্যাঙ্কে রাখলাম। সেটা না বলে, বাজেট-ঘাটতির কথা বলছে! এই ব্যাপারটা নিয়ে যিনি অভিযোগ করছেন তিনি যদি এই সহজ জিনিসটা বুঝতে না পারেন তবে তো বলব তার কেরানীগিরি করাও উচিত নয়। (সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন করছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। উনি বলেছেন বাজেট ঘাটতির সঙ্গে উদ্বৃত্ত রাজস্বের কোনও সম্পর্ক নেই। অসীম দাশগুপ্ত মাঝে মধ্যে যে ঘাটতি-শূন্য বাজেট দেখান সেটা আসলে ইকোনকমিক জাগলারি ছাড়া আর কিছুই নয় বলে শিবরঞ্জনবাবুর অভিমত।)

❑ মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আরও একটা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেছেন আপনাদের বিরুদ্ধে, যে আপনাদের সময় পুরসভার রাজ্য সরকারের প্রতি নির্ভরতা ছিল চল্লিশ শতাংশ, উনি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সেটা কমিয়ে ৩০%-এ এনেছেন।

● সত্যি কথা বলতে কি, লোকটা একদম লেখা-পড়া করেনি। আমার সময় দুটো কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছিল। তাতে ডি এ পেনশন এসব বৃদ্ধি করার সুপারিশ ছিল। এই ডি এ, পেনশন, এগুলো কারা দেয়? এগুলো তো দেয় রাজ্য সরকার। সেই কারণে এসব বাড়লে, রাজ্য সরকার স্বাভাবিকভাবেই বেশি টাকা আমাদের দেবে। এগুলো কমলে এমনিতেই রাজ্য সরকার টাকা কম দেবে। রাজ্য সরকার তো আর থোক টাকা দেয় না, কতগুলো হেডে টাকা দেয়। যেমন আমাদের পুরসভার কর্মীদের মাইনের ডি. এ-টা রাজ্যসরকার দেয়, পেনশনের একটা অংশও তারা দেয়। এই যে ষষ্ঠ পে-কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছে তা কার্যকর হলে রাজ্য সরকারের প্রদেয় অর্থের পরিমাণ তো প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বেড়ে যাবে।

❑ বিকাশবাবু আরও একটা বিষয়ে কৃতিত্ব দাবী করছেন যে আপনি বাজেট শুরু করেছিলেন ৮৫০ কোটি টাকা দিয়ে, সেখানে উনি শেষ করেছেন ৩২০০ কোটি টাকা দিয়ে। এবং এও দাবী করছেন যে এর সবটাই নাকি রাজস্ব থেকে আদায় হয়েছে। এই কৃতিত্ব স্বীকার করেন?

● আমার আমলে আমি একটা পয়সা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাইনি, ওনার আমলে নেহেরু আরবান ডেভেলপমেন্ট স্কীমে প্রচুর টাকা এসেছে সরকারের কাছ থেকে। কিন্তু পুরসভার আয় মোটেও বাড়েনি ওঁর আমলে। আমার সময়ে ভারত সরকারের ওই যোজনাটা ছিল না, যে কারণে আমাকে রাজস্ব আদায়ের দিকে মন দিতে হয়েছিল। যে এই ব্যাপারটা বুঝতে পারে না, তার পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আমার মাঝে-মধ্যে সন্দেহ হয়। সবচেয়ে বড় কথা ওদের অ্যাকাউন্টটা আমাকেই তৈরি করতে হয়েছিল। যেটা নেক্সট টু ইমপসিবল। কারণ ক্যাগের কাছে কিছুই ছিল না। ওদের প্রত্যেকটা বাজেট ছিল ফলস। এ জি বেঙ্গলের কাছে ক্লিয়ারেন্স না পেলে তুমি পরবর্তী বাজেট পেশ করতে পার না।

❑ উনি কিন্তু বলছেন যে ক্যাগ আপনাদের সমালোচনা করেছে, পক্ষান্তরে ওনাদের প্রশংসা করেছে।

● আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আমাদের সময়েই ক্যাগের সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পর্ক সবচেয়ে ভাল ছিল।

❑ বিকাশবাবু দাবী করছেন, গত পাঁচ বছরে কলকাতা শহরে তিনশো দশটা বেআইনি বাড়ি ভাঙা হয়েছে। আপনার আমলে নাকি তিনটেও ভাঙা হয়নি।

● একদম মিথ্যে কথা। যদি তিনশো দশটা বাড়ি উনি ভেঙে থাকেন আমি রাজনীতি করাই ছেড়ে দেব। আমি চ্যালেঞ্জ করছি উনি ওই তিনশো দশটা বাড়ির লিস্ট আমাকে দিন। আমি অনেক বাড়ি ভেঙেছি। উনি যেটা করেননি তা হলো সম্পত্তি কর আদায় করা, যে কারণে কুড়ি থেকে বাইশ শতাংশ রাজস্ব কমে গেছে পুরসভার। আদালত নির্দেশ দিয়েছে জলের লাইন কেটে দেবার, উনি কাটেননি। আমি গ্র্যাণ্ডের (হোটেল) জল কেটে দিয়ে কর আদায় করেছিলাম। প্যান্টালুনস (জামা-কাপড়ের বড় দোকান) থেকে শুরু করে অনেক বিত্তবান জায়গায় কর আদায় করেছি, সি এ বি-কে পর্যন্ত ছাড়িনি। উনি একটা জায়গার নাম বলতে পারবেন যেখানে জলের লাইন কেটে কর আদায় করেছেন?

❑ উনি বলছেন পুরসভার দালাল চক্রটা ওনার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আঙুলটা সম্ভবত আপনারই দিকে। এটাও বলছেন যে দালাল চক্র রুখতে উনি ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু করেছেন। কোনও মন্তব্য করবেন?

● এই দালাল-চক্রটাকে আমি প্রায় নির্মূল করে ফেলেছিলাম। আগে হেলথ সার্টিফিকেট, বার্থ-সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে পুরসভাকে কর দেওয়া সবই দালালের মাধ্যমে হোত। আমি এই ব্যবস্থাটার মৌলিক পরিবর্তন করেছিলাম। কেউ ট্যাক্স দিলে বা ট্রেড লাইসেন্সের জন্য টাকা দিতে চাইলে তার কাছে নোটিশ যাবে। তারপর সে চৌষট্টিটা ব্যাঙ্কের মধ্যে যে কোনওটাতে টাকা জমা করতে পারবে। এতে দালালের দরকার হোত না। উনি পার্টির চাপে পুরো সিস্টেমটাই তুলে দিলেন। এখন কে দোকান ফেলে করের টাকা দেবার জন্য চারদিন ঘুরবে! আর ওই যে ই-গর্ভনেন্সের কথাটা উনি বলেছেন, সেটাও আমারই বই থেকে আবিষ্কার করা। এশিয়ান ডেভেলপমেন্টের টাকা পাওয়ার জন্য প্রচুর কাগজ-পত্র তৈরি করতে হয়েছিল। সেখানে ই-গর্ভনেন্স, ট্রান্সপারেন্সি, এফিসিয়েন্সি এরকম চারটে পয়েন্ট আবিষ্কার করতে হয়েছিল আমায়।

❑ মার্কেট সংস্কারের ক্ষেত্রে কলকাতার বর্তমান মেয়রের অভিযোগ যে তিনি বিরোধীদের বাধায় কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

● লোকটা মূর্খও বটে! তুমি একটা কাজ কর। তুমি এই দক্ষিণ কলকাতাতেই প্রথমে ল্যান্সডাউন মার্কেটে যাও। যেটার কাজ ওরা চালু করেছিল। সেখানকার লোকের সাথে কথা বললেই ওই মার্কেটের করুণ অবস্থাটার কথা জানতে পারবে। এবার এসো দক্ষিণেরই লেক মার্কেটে। যার কাজ আমি আরম্ভ করেছিলাম। নিজের চোখে দেখ। সেখানকার লোকেরও ইন্টারভিউ নাও। পানী কা পানী, জল কা জল সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে!

❑ সে না হয় যাওয়া যাবে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা তাঁর আমলে পুরসভার সাফল্যের অগ্রাধিকারের তালিকায় বিকাশবাবু নিকাশি বন্দোবস্তকে সর্বাগ্রে রাখছেন। এটা বিশ্বাসযোগ্য বলে আপনার মনে হচ্ছে?

● বললে বিশ্বাস করবে না, 'অন রেকর্ড' বলছি ৫০০০ কোটি টাকা নিকাশির জন্য ওরা ভারত সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সেই টাকা লুঠ হয়েছে। আমরা দু'টো টাকার তদন্ত চাই। একটা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট স্কীমের, আরেকটা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া টাকার। কারণ পুরো ব্যাপারটাতেই ভারত সরকারের অর্থ রয়েছে।

❑ বিকাশবাবুর দাবী, উনি পুরসভার কর্মীদের জন্য ৭৫ হাজার টাকার মেডিক্লেমের বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু খুব ভুল না করলে এই ব্যবস্থাটা তো আপনিই চালু করেছেন। বিকাশবাবু মেডিক্লেমের ব্যাপারে আপনাকে অনৃতভাষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন।

● এই কথাটা ও বললে, ওকে থাপ্পড় মারা উচিত। সারা ভারতে একমাত্র কলকাতা পুরসভাই নিজের টাকায় কর্মীদের মেডিক্লেমের বন্দোবস্ত করেছিল। আর এটা হয়েছিল আমার আমলেই। অজ্ঞতারও একটা সীমা-পরিসীমা থাকা উচিত! য পলায়তি স জীবতি। উনি পালিয়ে গেছেন, তাই বেঁচে গেছেন।

❑ উনি এই পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন যে তাঁর চলে যাওয়ায় বিরোধীদের বুক দুরু দুরু কম্পমান হবে কারণ পরবর্তী মেয়র কে হবে এই নিয়ে না কি তারা চিন্তায় মরবে!

● বলতেই হচ্ছে, লোকটা শুধু নির্বোধই নয়;ও পাজি তো আমি জানিই। অনেক দোষ আছে....

❑ স্টিফেন কোর্ট কাণ্ডেও ওনার আঙুল কিন্তু আপনার দিকে। কারণ '৭৫-এ স্টিফেন কোর্ট তৈরির সময় পুরমন্ত্রী তো আপনিই ছিলেন?

● লোকটা দেখছি কোনও লেখাপড়াই করেনি। উনি তো আইনজীবী নন, লাইনজীবী। '৭৫-এ সরকারে থাকাকালীন আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম তখন প্রশাসন চালাতেন মিঃ সমাদ্দার। খুব সিনিয়র অফিসার। ইক্যুভালেন্ট টু চীফ সেক্রেটারী। তখন ১৯৮০ মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট আসেনি। মেয়র নেই, কাউন্সিলার নেই হাউস বলে কিছু নেই। একজন মন্ত্রীর পক্ষে দু'শোটা পুরসভার দেখভাল করা সম্ভব নয়। তো সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটার নির্দেশ দিয়েছিলেন রাস্তা-ফাস্তা কতটা চওড়া তার ওপর নির্ভর করে দোতলা বানাতে। তাও তো সেটা বানাতে পারেনি। নিয়ম অনুযায়ী অনুমোদন পাবার পর পাঁচ বছরের মধ্যে যদি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান না করতে পার তবে অনুমোদনই বাতিল হয়ে যাবে। ওদেরও বাতিল হয়ে গেছিল। পরে '৭৭-এ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে প্রশান্ত শূর আবার নতুন করে স্টিফেন হাউস কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন দেন। এটাই হলো গল্প।

❑ মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য পরিচালিত পুরবোর্ডের ব্যর্থতার বিস্তারিত খতিয়ান আপনি অবশ্যই দিতে পারেন। কিন্তু মুখ্যব্যর্থতা হিসেবে কিছু চিহ্নিত করতে চাইবেন?

● দু'টো জিনিস। এক, প্রশাসনকে পার্টির প্রশাসন করে তোলা। সেখানে দুর্নীতি চরমে উঠেছে, দালালরাজও তুঙ্গে, টাকা ছাড়া এখানে তোমার কোনও কাজ হবে না। দ্বিতীয়ত, পরিষেবাটা হঠাৎ একেবারে বসে পড়েছে।

❑ উনি অভিযোগ করেছেন, আপনারা বিশেষ করে মমতা ব্যানার্জী কলকাতাকে লণ্ডন বানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আপনি একে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার কথা বলেছেন, বিকাশবাবুর বক্তব্য আপনারা গরীবদের কথা ভাবছেন না?

● (তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে) হ্যাঁ, খুব ভেবেছে গরীবদের কথা। ভেবে ভেবে কলকাতার সংস্কৃতির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। ওদের সব নাটক-টাটক দেখবে পার্টির স্লোগানভিত্তিক গ্রুপ থিয়েটার গোছের। বাঙালীর অরিজিনাল কালচারের সব থিয়েটারগুলোকে এরা তুলে দিয়েছে। এখন কোনও থিয়েটার-হল চলছে না। বিভিন্ন দেশের কপি করে, হাইলি পলিটিক্যাল কথাবার্তা বলে বাঙালী সংস্কৃতির যা বারোটা বাজানোর এরাই বাজিয়ে দিয়েছে।

বর্ষবরণে সংস্কার ভারতী

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ গত ১৪ এপ্রিল সংস্কার ভারতী আয়োজিত একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে একাডেমীর মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও সংস্কৃতি জগতের দুই প্রবীণা ব্যক্তিত্ব শ্রীমতী নির্মলা মিশ্র এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্তা ভাস্কর শ্রীমতী উমা সিদ্ধান্ত।

নববর্ষের প্রাক সন্ধ্যায় সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা দুই অতিথিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করলেন। মঞ্চে সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীপূর্ণচন্দ্র পুইতুণ্ডী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী নির্মলা মিশ্র ও শ্রীমতী উমা সিদ্ধান্ত উভয়েই তাঁদের বক্তব্যে সংস্কার ভারতীয় কর্মপদ্ধতি ও আদর্শের প্রতি অনুরাগ ও আস্থা প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গত, প্রথম পর্বের সমাপ্তিতে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশনের ভূয়সী প্রশংসা করেন শ্রীমতী নির্মলা মিশ্র।

পবরর্তী সাংস্কৃতিক পর্বে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কার ভারতীর সোনারপুর শাখার উপস্থাপনায় বাদ্যযন্ত্রের অনুষঙ্গে একটি সৃজনশীল সমবেত নৃত্য। সঙ্গীত শিল্পীরা দুটি বৃন্দগান পরিবেশন করেন। প্রবীর ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে পাঠ এবং দক্ষিণ হাওড়া শাখার নৃত্যানুষ্ঠানের পর আমন্ত্রিত 'প্রতিভা' নৃত্য গোষ্ঠীর শিল্পীদের 'তাসের দেশ' সহ নববর্ষ ১৪১৭ আবাহন উৎসবটি প্রশংসার দাবী রাখে।

শব্দরূপ - ৫৪৭

শ্রেষ্ঠা ঘোষাল

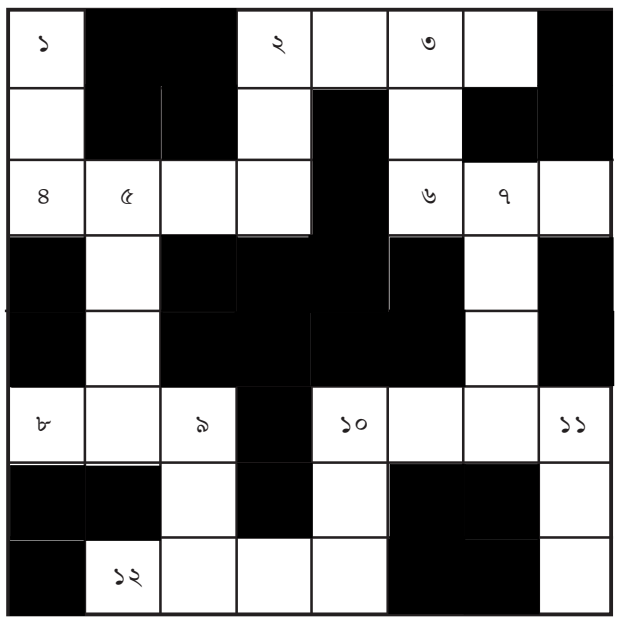

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. কশ্যপ-তনয় বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ও দশরথের জামাতা, ৪. বিশেষণে পণ্ডিত, শাস্ত্র পারদর্শী, ৬. ভাল, কপাল, ৮. বিষ্ণুর পঞ্চ ম অবতার, ১০. জগতের সর্বলোক, সর্বসাধারণ, ১২. সমুদ্রমন্থন কালে দেবতারা একে মন্থন-রজ্জু রূপে ব্যবহার করেন, প্রথম দুয়ে সমাপ্তি।

উপর-নীচ ঃ ১. উপাধি, ২. চারটি বেদের মধ্যে প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ, ৩. শিকল, নিগড় তৎসম শব্দে, ৫. বিষ্ণুর প্রতীক রূপে পূজিত গণ্ডকী-নদীজাত শিলা, ৭. বিশেষণে নিষ্কর, একে-তিনে ওয়েষ্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার, শেষ দুয়ে, অধিপতি, ৯. চন্দ্রবংশীয় পুররবা-উর্বশীর পুত্র, আয়ু নামক রাজার পুত্র এঁর পুত্র যযাতি, ১০. তৎসম শব্দে পাখি, ১১. আকাশচারী।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৪৫

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯
ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া
বেড়াবেড়িয়া, বাগনান,
হাওড়া-৭১১৩০৩
রাজেশ তালুকদার
বৈদ্যবাটি-৭১২২২২

ক	ম	লা	স	ন	■	বৈ
■	ন্দা	■	■	ন্দি	■	কু
■	কি	■	■	নী	ল	ক	ণ্ঠ
সু	নী	তি	■	■	লি	■	■
■	■	মি	■	■	তা	ক	র
ঋ	ক্ষ	র	জা	■	■	ল্প	■
ত্থে	■	■	হ্ন	■	■	ত	■
দ	■	■	বী	র	পু	রু	ষ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৪৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩১ মে, ২০১০ সংখ্যায়

স্বীকার করেই নিলেন পুরসভার সীমাবদ্ধতা

(৮ পাতার পর)

প্র প্রথমত বলবো, নিকাশি ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতির কথা, যেটা বিরোধীরা আজ পর্যন্ত করতে পারেননি, এমনকী করার কথাও ভাবেননি। পানীয় জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রেও আমরা প্রভূত উন্নতি করেছি গত পাঁচ বছরে;পলতা থেকে টালা মাটির তলার যে পাইপ নষ্ট হয়ে গেছে, তাকে পাল্টে দেওয়া;নতুন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট করার জন্য এখন ধাপায় (বাইপাসে) হচ্ছে জ্যোতি বসু জল শোধনাগার প্রকল্প, গার্ডেনরিচে নতুন করে পনেরো মিলিয়ন গ্যালন জল প্রকল্প হচ্ছে, তারপর কে ই আই পি-র কাজে গতি বৃদ্ধি র ফলে মাটির তলায় প্রায় তিনশ-সাড়ে তিনশ কিলোমিটার নতুন সোয়ারেজ পাইপ বসেছে। খাল পরিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা দারুণ উন্নতি করেছি। মিড ডে মিল চালু করার ফলে আমাদের ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই একটিমাত্র কারণে আমি মনে করি যে কলকাতা পৌরসংস্থা গত পাঁচ বছরে অনেক বড় কাজ করেছে। আমরা কলকাতা শহরে ১৩৭টি ওয়ার্ডে ম্যালেরিয়া ক্লিনিক চালু করেছি। ১৩৫টি ওয়ার্ডে হেলথ ক্লিনিক চালু হয়েছে। কলকাতার রাস্তাঘাটের চেহারা আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। জঞ্জাল পরিষ্কারে আমাদের সাফল্য কেন্দ্রীয়ভাবে স্বীকৃত, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রশংসা করেছেন। বিভিন্ন রাজ্য আমাদের ডেকে পাঠাচ্ছে এব্যাপারে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য।

শ্র আপনি সর্বাগ্রে নিকাশি ব্যবস্থার যে উন্নতি দাবী করলেন, বর্ষার আমহার্স্ট স্ট্রীট বা বেহালায় গেলে কেউ এটা বিশ্বাস করতে চাইবে? শুধু বর্ষা কেন, একপশলা বৃষ্টি হলেই সেখানে কয়েকঘণ্টা জল দাঁড়িয়ে যায়। এই অবস্থায় নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির দাবী করাটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?

প্র আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চ লে আমার জন্মের আগে থেকেই জল দাঁড়ায়। বেহালার একটা অংশ কে ই আই পি-র কাজ যেখানে হয়েছে, সেখানে গতবার জল দাঁড়ায়নি। আমরা যখন এসেছিলাম তখন নিকাশি একপ্রকার বেহাল ছিল, এখন চলে যাবার সময় বলছি যে হাল ফিরেছে।

শ্র আপনার পুরবোর্ডের সাফল্যের খতিয়ানে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন জল সরবরাহকে। কিন্তু কয়েকমাস আগে একজন ভদ্রমহিলা 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায় লেখা চিঠিতে অভিযোগ করেন, পুজোর দিনগুলোতে কলকাতা পৌরসংস্থা তাঁর এলাকায় ঠিক মতো জলসরবরাহ করেনি। এর কারণ অনুসন্ধান করে তিনি জানতে পারেন ওই সময় মুসলিমদেরও কোনও পরব থাকায় মেটিয়াবুরুজ এবং ওই সমস্ত মুসলিম প্রধান এলাকাগুলোতে জল সরবরাহের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে কারণে তাঁদের এলাকাগুলোতে ঠিক ভাবে জল সরবরাহ করা যায়নি। কলকাতা পুরসভার বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের যে অভিযোগটা উঠেছে তা যাচাই করেছেন?

প্র যিনি এমন কথা লিখেছেন, আমি বলবো তিনি নিম্ন-রুচির পরিচয় দিয়েছেন। ওভাবে জল সরবরাহ হয় না। আমি কান ধরে বললাম জল তুই মেটিয়াবুরুজ যা, এখানে যা ওখানে যা—এই জিনিসটা হয় না। যিনি এই বক্তব্য রেখেছেন আমি তীব্র ভাষায় তাঁর নিন্দা করছি।

শ্র গড়িয়াহাট ট্রেজারি কেলেঙ্কারী নিয়েও তো আপনাদের পদক্ষেপ খুব একটা সাফল্যব্যঞ্জক কিছু নয়।

প্র এটা তো আমার আমলে হয়নি। হয়েছে সুব্রতবাবুর আমলে। আমরা আসার পরেই সেই দু'জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তাঁদের ছাঁটাই করে দিয়েছি এবং তাদের বিরুদ্ধে এখন ক্রিমিনাল কেস চলছে।

শ্র সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছেন তিনি পুরসভার কর্মীদের অবসরের ১০ দিনের মধ্যেই পেনশনের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন যে জিনিসটা আপনার আমলে ব্যাহত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আপনার পুরবোর্ড কর্মীদের মেডিক্লেমের টাকা দিতেও টালবাহানা করেছে।

প্র বলতেই হচ্ছে, সুব্রতবাবু অনৃতভাষণে অভ্যস্ত। উনি একজন পেনশনারকেও যদি দেখাতে পারেন যে, তিনি পেনশন পাননি তবে অভিযোগ স্বীকার করে নেব। বরং আমার আমলেই পেনশন ফাণ্ড তৈরি হয়েছে। আমার সময়েই পুরসভার প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য ৭৫ হাজার টাকা মেডিক্লেম করা হয়েছে। প্রতি বছর তাদের বেতন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেলের ভাতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে পে-কমিশন অনুযায়ী।

শ্র নিন্দুকেরা আপনার বিরুদ্ধে রটাচ্ছে যে কলকাতা হলো একটা সংস্কৃতি-মনস্ক শহর। রবীন্দ্র-নজরুল সংস্কৃতি চর্চার এই শহরে দাদাঠাকুরের (শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী) আমল থেকে আজ পর্যন্ত কোনওদিন আর যাই হোক 'রুটি-কাপড়া-মকান'-কে অ্যাজেণ্ডা করে রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে লড়তে হয়নি। আপনার আমলে কলকাতার এমনই নাকি হতশ্রী দশা হয়েছে যে ওই তিনটি বিষয়কেই এবার হাতিয়ার করছে রাজনৈতিক দলগুলো?

প্র কলকাতায় চিরকালই নির্বাচন হয়েছে সার্বিক সমস্যার ওপর ভিত্তি করে। আর যাঁরা এরকম বলছেন...খুব ভাল তো! যদি সাধারণ মানুষ মনে করেন যে তাঁরা খাবার পাচ্ছেন না, কাপড় পাচ্ছেন না, থাকার জায়গা পাচ্ছেন না, তবে সেটা ভাল ব্যাপার। কারণ সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলোকে বাদ দিয়ে তো ভেবে লাভ নেই। কলকাতাকে যারা খুব 'এলিটিস্ট' জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন তাঁরা আসলে কলকাতার গরীব-গুর্বো মানুষের কথা ভাবছেন না।

শ্র আমাকে একটা সত্যি কথা বলুন, বিকাশ ভট্টাচার্যের পুরবোর্ড বিগত পাঁচ বছরে কলকাতার সেই সমস্ত গরীব-গুর্বো মানুষদের জন্য আদৌ কি কিছু করেছে?

প্র পুরসভার একটা সীমাবদ্ধ তা আছে। তবে যতটুকু আমাদের ক্ষমতা আছে তার নিরীখে চোখ বুজে বলে দেওয়া যায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে যা আগে কখনও হয়নি।

শ্র আর কিছুদিন পর আইনজীবীর ব্যস্ত সময়ের মধ্যে কলকাতা পুরসভাকে কখনও মনে পড়বে?

প্র কেন মনে পড়বে না? আমি যদি কলকাতায় পুরসভায় কাজ করতে করতে আইনজীবী পেশার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারি, তবে আইনজীবী পেশায় থেকে কলকাতা পুরসভার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব না কেন?

আত্মবিশ্বাস বাড়াতে

(১২ পাতার পর)

প্রথমে ইন্টারভিউয়ারদের দিকে সহাস্যে সম্ভাষণ জানাতে হবে। Hallo Good Morning everybody, I am....(নাম)....I am here for the 11 O'clock. Interview for the Position of Personal Secretary. বসতে বললে তবেই প্রার্থী চেয়ারে বসবেন।

কথা বলার সময় সরাসরি নিয়োগকারীদের চোখে চোখ রেখে কথা বলা খুবই জরুরি। এতে প্রার্থীর আত্মবিশ্বাস আছে বোঝা যায়।

ইন্টারভিউ শেষ হলে বিদায় সম্ভাষণটাও সুন্দর হতে হবে—'Thank you everybody for talking to me. I hope to hear from you soon. Goodbye!'

চলে যাবার সময় রিসেপশনিস্টকে ফের ধন্যবাদ জানাতে যেন ভুল না হয়।

শুধু ইন্টারভিউ চলার সময় নয়, চাকরি-প্রার্থী যতক্ষণ ওই অফিসে থাকবেন ততক্ষণ তাঁর আচরণ যেন সেবার স্তরে থাকে। মনে রাখতে হবে, বাছাই প্রক্রিয়ায় যদি অফিসের কর্মীদের মতামতের কোনও গুরুত্ব থাকে, তাহলে প্রার্থীর সম্বন্ধে নেতিবাচক কোনও মন্তব্য শেষ পর্যন্ত মারাত্মক হতে পারে। সুতরাং first impression-ই যে last impressio-, একথাটাও যেন মনে থাকে। যাঁরা ইন্টারভিউ নেবেন, তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারটাই কিন্তু একমাত্র বিবেচ্য নয়, যে রিসেপশনিস্ট বসতে দিলেন এবং যিনি ইন্টারভিউর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন, তাঁদের সঙ্গে উষ্ণ ব্যবহারও একইরকম জরুরি। প্রার্থীর মধ্যে যে নিখুঁত পেশাদার হওয়ার সম্ভাবনা আছে, একথাটা প্রমাণ করতে হবে ওইটুকু সময় ও সুযোগকে কাজে লাগিয়েই।

—নীল উপাধ্যায়

দিদি যখন 'নামাজী' সাজেন

নটরাজ ভারতী

দিদি আবার 'নামাজী' সেজেছেন। রেলের পয়সায় তার সেই ছবি ছাপাও হয়েছে। নেহাত ছবির নিচে নামটা দেওয়া আছে। সেই সঙ্গে ভারত সরকারের রেলমন্ত্রী সেকথাও লেখা আছে। না হলে মমতা ব্যানার্জী না মমতাজ বেগম বুঝতে ভুল হতে পারে। গুলিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ দিদির মুসলমানী সাজা বড় নিখুঁত। ব্যক্তি মমতা ব্যানার্জী মুসলমান সাজলেন না খৃষ্টান সাজলেন তাতে কারো কোন যায় আসে না। কিন্তু দিদি যখন মুসলমান সেজে জনগণের টাকায় ছবি ছাপবেন তখন জনগণ প্রশ্ন তুলবেই। প্রশ্ন উঠবে এই ভণ্ডামি বা ভাঁড়ামোর প্রয়োজনীয়তা নিয়েও। এর আগে সিঙ্গুরের ধর্নামঞ্চে দিদি মুসলমান সেজে নামাজ পড়েছিলেন। ব্যক্তিগত প্রেরণায়। এবার দিদি মুসলমান সেজেছেন রেলের উদ্যোগে। জনগণের টাকায়।

দিদি এখনও মুসলমান হননি। তিনি সেজেছেন। সাজা আর হওয়া এক নয়। বিভিন্ন স্কুলে যেমন খুশী তেমন সাজো প্রতিযোগিতা হয়। কেউ ডাক্তার সাজে কেউ উকিল। আবার কেউ পাগল সাজে। কিন্তু তারা কেউ ডাক্তার উকিল নয়। পাগলও নয়। আমি ডাক্তার সাজলেই ডাক্তার হবো না। সবাই জানে। দিদি মুসলমান সাজালেই মুসলমান হবেন না। এটা মুসলমানরা জানে। 'হিন্দু' হতে হয় না। কিন্তু মুসলমান হতে হয়। এখনও ধনী দরিদ্র সমস্ত মুসলমান বালকের ৮-৯ বছর বয়সে মুসলমানীকরণ করা হয়। মুসলমান হতে গেলে 'কলমা' পড়তে হয়। দিদি সেসব কিছু করেননি। দিদি শুধু মুসলমান সেজেছেন। তারপর রেলের পয়সায় কাগজে সেই ছবি ছাপিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন আমি তোমাদেরই লোক। একেবারে ঘরের লোক। কিন্তু মুসলমানরা জানে এ দিদি মুসলমান সাজা দিদি,—মুসলমান হওয়া দিদি নয়।

দিদি কালীঘাটে থাকেন। কাছেই মায়ের মন্দির। কোনদিন দিদি লালপাড় শাড়ি পরে কপালে লম্বা সিঁদুরের টিপ নিয়ে মা মা করতে করতে এলোচুলে পুজোর থালা আর ফুলের সাজি নিয়ে বেরিয়ে আসছেন এমন ছবি দেখিনি। দিদি কখনো জয় মা বলে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় ডুব দিয়ে সূর্য প্রণাম করছেন তেমন দৃশ্যও দেখিনি। বুকে ক্রশ ঝুলিয়ে নানদের মতো ড্রেস পরে দিদি গির্জায় প্রেয়ার করছেন তেমন ছবি কখনো ছাপা হয়নি। দিদি রঙীন চুড়ি, ছাপা শাড়ি, আর মাথায় আমের পাতা গুঁজে এরাজ্যের আদিবাসীদের সঙ্গে নাচছেন—কখনো দেখিনি। দিদি বৌদ্ধ সেজেছেন—শুনিনি কখনো। দিদি শুধু মুসলমান সাজেন। সাজা সহজ। ধান্দাবাজিটা আরও পরিষ্কার।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমি মুসলমানদের কাছের লোক এটা প্রমাণ করার জন্য মুসলমান সাজতে হবে কেন? মুসলিম প্রধান এলাকায় দিদি

মুসলিম সাজছেন। ভালো কথা। পাঞ্জাবে রেলের প্রকল্প উদ্বোধনে দিদি কি পাতিমালা পরে ওড়না নিয়ে শিখ সাজবেন। গ্যাংটকে বৌদ্ধ। রেলের উদ্যোগে হাওড়া অথবা শিয়ালদহ স্টেশনের ভিখারীদের জন্য কোনও প্রকল্প উদ্বোধনে গিয়ে—দিদি কি স্টেশনে ছেঁড়া শাড়ি পড়ে বাটি হাতে নিয়ে বলবেন—"আল্লা কে নাম পর কুছ দে দে বাবা।।" দিদি ভিখারী সাজাবেন। এসব অত্যন্ত রূঢ় কথা। শুনতে খারাপ লাগবে। কিন্তু দিদি যেভাবে মুসলমান এলাকায় গিয়ে মুসলমান সাজা শুরু করেছেন তাতে এমন ভাবাটাই তো স্বাভাবিক।

মুসলমানদের উপকার করার জন্য যে মুসলমান সাজার দরকার হয় না এই সরল সত্যবোধটুকুও দিদির নেই। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে দিদি বিশেষ অজ্ঞ। তাই এই অধঃপতন। সত্যের থেকে মুখ ফেরাতে মিথ্যা মিথ্যা খেলা। দিদি গান করেন। দিদি ছবি আঁকেন। দিদি কবিতাও লেখেন। শুধু ভারতীয় সংস্কৃতি আর পরম্পরা সম্পর্কে দিদির জ্ঞান নিয়ে সন্দেহ আছে। আর্য ঋষিরা বলেছিলেন—'সবাই অমৃতের পুত্র', পৃথিবীর সবাই সুখী হোক। এজন্য তাদের মুসলমান বা খৃস্টান সাজতে হয়নি। রাজা শিবাজী নিজের রাজ্যের মুসলমানদের জন্য একের পর এক মসজিদ তৈরি করে দিয়েছিলেন। এজন্য তাকে কখনো নামাজ পড়তে হয়নি। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, সুভাষ সবাই মুসলমানদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কাউকে মুসলমান সাজতে হয়নি। মানুষ হয়েই করেছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ধর্ম, সব ধর্মের মানুষকে কাছে টানে। আপন পরম্পরা অনুসারে আপন উদারতায়। ভারতের প্রতি ধূলিকণায় সেই স্পর্শ। এরজন্য কোনও ভণ্ডামির দরকার হয় না। সাজারও দরকার হয় না। ধর্ম কি লালপাড় শাড়িতে সিঁদুরে না আলখাল্লা জোব্বায়? মুসলমানদের উন্নতি করতে গেলে মুসলমান সাজতে হবে অতি বড় আহাম্মকেও একথা বিশ্বাস করবে না। এ রাজ্যের বহু মুসলমান পাশ্চাত্য পোশাক পরেন, দাড়ি রাখেন না, অনেকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন না। কিন্তু তারা মুসলমান নয়, একথা কেউ বলেন না। ভেক নইলে ভিখ মেলে না— গ্রাম্য প্রবাদ। মুসলমান না সাজলে ভোট মিলবে না। ডক্টরেট দিদির বিশ্বাস।

দিদি মুসলমান সেজেছেন। ভালো করেছেন। ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সরকারি পয়সায় ছবি ছেপেছেন। তাও ভালো। কিন্তু এই ভণ্ডামি তো ভারতীয় সংস্কৃতির অপমান। দিদির দেখাদেখি যদি তার নেতারাও এমন সব সাজতে শুরু করেন রাজ্যটা তো বহুরূপীতে ভরে যাবে। দিদির দলের নেতারা সবাই যদি এমন মুসলমান সাজতে শুরু করে সত্যিকারের মুসলমানদের কি হবে। দিদি যদি হঠাৎ ফরমান জারি করেন যে মুসলমান প্রধান এলাকায় যেতে হলে তৃণমূল নেতাদের লুঙ্গি-আলখাল্লা আর টুপি পরে যেতে হবে তাহলে তো জোকারের সংখ্যা বাড়বে। তৃণমূলী সংস্কৃতির যদি এই হাল হয় তবে ঘোড়া কেন—রামছাগলেও হাসবে।

স্কুল কলেজ জীবনে যেমন খুশী তেমন সাজা প্রতিযোগিতায় দিদি কখনো নাম দিয়েছিলেন কিনা জানা নেই। তবে এখন যদি এ রকম কোনও প্রতিযোগিতায় নাম দেন এবং মুসলমান সাজেন প্রথম পুরস্কার বাঁধা। দিদি জানেন না তার এই ভাঁড়ামো দেখে হিন্দুরাও হাসছে। হাসছে মুসলমানরাও, মুসলমানদের জন্য দিদি যদি কখনো মা কালী সাজেন—তখন কি হবে। দিদি কার উপরে দাঁড়াবেন। অবশ্য ভোট হোক বা না হোক বিনোদন হবে খুব।

বিপ্লবী শঙ্করাচার্য

(১১ পাতার পর)

আসলে ইতিহাসে আমরা দেখি শিক্ষাই জাগায় চেতনা, আর চেতনাই ঘটায় উত্তরণ। এরপর তা রূপ পায় বাস্তব জীবনে ও সমাজে। কতগুলি প্রতিষ্ঠান, নিয়মকানুন, ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিবর্তন করে ভাবজগতে মৌলিক পরিবর্তন আনে, তারপর নতুন জীবন আচরণে মানুষকে প্রবৃত্ত করে তাকেই আমরা বলি বিপ্লব। আগে ভাবজগতে পরিবর্তন ঘটিয়ে পরে তা বাস্তবে রূপ দিতে হবে। বৌদ্ধ মতবাদ প্রায় এক হাজার বছর ধরে রাজত্ব করে শেষে অবক্ষয়ের পথে চলেছে। এরফল হলো গুহ্য তান্ত্রিকাচার, সহজযান, মহামান ইত্যাদি। এসব পথ থেকে শুদ্ধতার পথে নিয়ে গিয়েছিলেন শঙ্করাচার্য। বুদ্ধদেবের 'নির্বাণ' ও শঙ্করাচার্যের মোক্ষতত্ত্বের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। আসলে বুদ্ধদেব যে সংস্কারকে সমূলে দূর করতে চেয়েছিলেন তা কখনই পারা যায় না। সেজন্য তার পরিণতিও ভাল হয়নি। এজন্য অনেকে শঙ্করাচার্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে থাকেন।

একটা জাতির পরিচয় থাকে ইতিহাসে। দর্শনে সেই পরিচয় হয়ে ওঠে আরও সত্যতর ও উজ্জ্বলতর। কেননা দর্শনে থাকে সত্যের সন্ধান। একটা চৈতন্যের উন্মেষ ঘটায় দর্শন। আর ইতিহাসে থাকে কতগুলি ঘটনা, সাল, যুক্তি। সমাজে পরিবর্তনের যখন সময় এগিয়ে আসে তখন তা ফুটে ওঠে প্রথমে দর্শনে, তারপরে প্রভাব ফেলে ইতিহাসের পাতায়। ফরাসি বিপ্লবের অনেক আগে দেখি ভলতেয়ার ও রুশোর দর্শন। আবার দেখি, মার্ক্সীয় দর্শনের পরে ঘটেছে রুশবিপ্লব। বুদ্ধের দর্শন আগে, পরে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে পূর্ণিমা রাত্রিতে ঘটেছে নিঃসঙ্গ মনে পরম সত্যের উপলব্ধি। বুদ্ধের ভাব বা দর্শন-সবই চারটি আর্য সত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার ফল নিশ্চয়ই ভাল হয়নি। এতে মানুষের ভাববৈচিত্র্য সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সনাতন ধর্মমতে মানুষকে এক ছাঁচে ঢালা হয়নি। এক ক্ষুরে সবাইকে যেমন মাথা মোড়ানো যায় না। শঙ্করাচার্য এই সনাতন তথা হিন্দু ঐতিহ্যকেই গ্রহণ করেছেন এবং তার ব্যবহারের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

তিনি নিজের 'অদ্বৈতবাদে' অবিচল ছিলেন। এই মতের মূল কথা হলো—এক এবং অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্ম (চৈতন্য বা আত্মা) একমাত্র সত্য। জগৎ মিথ্যা। জীব স্বরূপত ব্রহ্ম, জীব অজ্ঞানবশত তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়। জ্ঞানেই মুক্তি।

অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মতো আর কেউ এমন চমৎকার দেব-দেবীদের স্তোত্র-বন্দনা করতে পারেননি। তিনি একস্থানে বলেছেন—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরা'। আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে তার কথাকে, মূলত কোনও ভেদ নেই। তাই তিনিই বলতে পারেন—'আমি একও নই, অনেকই নই, আমি অদ্বৈত।'

বিশ্ববন্দিত স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় চমৎকারভাবে ভারতীয় দর্শনের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন—হিন্দুধর্মে 'এক্সক্লুসিভ' বলে কিছু কথা নেই। আমরা কাউকে বাদ দিই না। সবাইকে মেনে নিই, গ্রহণ করি। শঙ্করাচার্য সেই ধারারই মূর্ত প্রতীক। তিনিই ছিলেন একমাত্র সনাতন ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ। তিনি ভারতে এনেছিলেন যুগান্তর, জাতির আত্মাকে জাগ্রত করেছিলেন। গীতায় যাঁকে বলা হয়েছে পুরুষোত্তম, সোজা কথায় পরমপুরুষ। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য তাঁকেই বলেছেন অদ্বৈত শিব, তিনিই আত্মতত্ত্ব। সবাই নির্বাণমুখী সাধনা করবে এটা হিন্দুশাস্ত্রের বিধান নয়। মানব জীবনের বিকাশই বৈদিক তথা সনাতন সভ্যতার উদ্দেশ্য।

এই আলোচনার শিরোনামে তাঁকে বিপ্লবী হিসাবে ভূষিত করা হয়েছে। মাত্র বত্রিশ বছরের মধ্যে যুগপুরুষের দায়িত্ব শেষ করেছিলেন তিনি। মোটামুটিভাবে দেখি—

(ক) সন্ন্যাসীদের সংগঠন—সন্ন্যাসী সমাজকে দশনামী সম্প্রদায়ে সংগঠিত করলেন।

(খ) চারটি মঠ স্থাপন।

(গ) প্রাচীন শাস্ত্রের ভাষ্য রচনা—ব্রহ্মসূত্র ইত্যাদি।

(ঘ) বৌদ্ধধর্মের যুক্তি খণ্ডন এবং সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা।

জীবনের স্বল্প পরিসরে তিনি যে বৈপ্লবিক চেতনা মানুষের মনে ও মননে এনেছিলেন তার সেই ধারা আজও অমলিন। কারণ, তা মালিন্যের ঊর্ধ্বে। তাঁর রচিত শ্লোকেই শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে অদ্বৈতকে স্মরণ করি—

"ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাতৃ প্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিষ্কলং নির্বিকল্পম্।।"
(ব্রহ্মস্তোত্রম্, ২নং)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

১। আচার্য শঙ্কর —ব্রহ্মচারী শিশির কুমার ২ সং

২। সমন্বয়ের প্রতীক আচার্য শঙ্কর এবং মণিরত্নমালা ও স্তোত্রাবলী—ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী; ২০০২ সং

৩। ভজ শঙ্করাচার্য — স্বামী চিন্ময়ানন্দ।

৪। সাপ্তাহিক বর্তমান—বর্ষ ১৮।। সংখ্যা ৪৭।।২২ এপ্রিল ২০০৬।

Swastika
17 May - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

বসে (বাঁ দিক থেকে) ভরতকুমার, অমিয় রায়, অসীম কুমার রায় ও কালিদাস বসু।

কেউই আইনের উর্দ্ধে নন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'রুল অফ্ 'ল'-আমাদের সংবিধানের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক বিষয়। সংসদ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েও রুল অফ্ ল-কে অমান্য করতে (Abrogate) পারে না। উপরোক্ত কথাগুলি কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের। গত ৩০ এপ্রিল অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের অনুমোদিত ন্যাশানালিস্ট ল'ইয়ার্স ফোরাম-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখা কর্তৃক আয়োজিত—"The Concept of Rule of Law in the Constitution of India" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। কলকাতা সিটি সিভিল কোর্টের তে'তলার বার এসোসিয়েশন হলে কলকাতার ব্যবহারজীবী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকদের উপস্থিতিতে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি শ্রীরায় আরও বলেন, যে কোনও সভ্য সমাজের পক্ষে রুল অফ্ ল' বা আইনের শাসন হলো মূল ভিত্তি বা মেরুদণ্ড। গণতন্ত্রের জন্যও আইনের সর্বোচ্চ শাসন বা মান্যতা (Supremacy of Law) একান্ত অপরিহার্য। আইনের চোখে সকলেই সমান। তা তিনি যে কোনও পদেই বহাল থাকুন না কেন। এমনকী সাংবিধানিক পদে থাকলেও। গরীব, বড়লোক ব্যক্তি নির্বিশেষে আইন সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। কেউই আইনের উর্দ্ধে

ন্যাশানালিস্ট ল-ইয়ার্স ফোরামের সেমিনার

নন। আইন সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সবকিছুই আইনমাফিক হতে হবে। স্বাধীনতার ব্যবহারও আইনিভাবে নির্দিষ্ট। আইন সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কিনা তা দেখে বিচারবিভাগ (Judiciary)। গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের উপর ভর করে।

আমাদের সংবিধান কতকগুলো বুনিয়াদি অধিকার দেশের নাগরিকদের জন্য দিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে মৌলিক অধিকার। শুধুমাত্র সংবিধানে লিখিত থাকাই যথেষ্ট নয়। অধিকারের গ্যারান্টি চাই। নাগরিকের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখা বিচার বিভাগের দায়িত্ব, কর্তব্য।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ১৯,২০, ২১, এবং ৩১ নং ধারা এবং উপধারায় বলা আছে আইনের অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। এমনকী সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন মামলার রায়ে সর্বোচ্চ আদালত সংবাদ মাধ্যমের এক্তিয়ারও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সম্প্রতি জেসিকা লাল হত্যা মামলার রায়ের প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ আদালত বলেছেন, সংবাদমাধ্যম যে কোনও বিষয়েই উত্থাপন করতে পারে। তবে দোষী আর কে নির্দোষ তা কিন্তু স্থির করবে আদালত বা কোর্ট। যে-ই দোষী হউক তারও আইনের অধিকার রয়েছে।

'মহীন্দ্রা অ্যান্ড মহীন্দ্রা' কোম্পানীর জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে, অনেক বছর আগে কেশবানন্দ ভারতী-মামলায় সুপ্রীম কোর্ট তার রায়ে সরকারের অধিকারও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। পুলিশের গ্রেপ্তার করার অধিকার রয়েছে কিন্তু পদ্ধতিগত ভাবে তা ঠিক কি ভুল তাও দেখতে হবে। এই দেখার দায়িত্ব বিচারবিভাগের।

সব মিলিয়ে কেউই আইনের উর্দ্ধে নন বলে বিচারপতি শ্রী রায় মন্তব্য করেন।

এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিচারপতি অসীমকুমার রায়। স্বাগত ভাষণ দেন ন্যাশানালিস্ট ল'ইয়ার্স ফোরামের সভাপতি অ্যাডভোকেট অমিয় রায়। মঞ্চে ছিলেন প্রবীণ ব্যবহারজীবী কালিদাস বসু। সভা পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট অজয় নন্দী। বন্দেমাতরম্ দিয়ে সভা সমাপ্ত হয়। শতাধিক অ্যাডভোকেট অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অধিবক্তা পরিষদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেট ডি. ভরতকুমার সমাপ্তি ভাষণ দেন। মহিলা ব্যবহারজীবীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রধান বক্তা ছাড়াও প্রাক্তন বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ফারুক এম রজ্জাকের বক্তব্য সভায় পাঠ করে শোনানো হয়।

আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী ব্যাখ্যানমালা

শাস্ত্রীজী বিরোধীদের আপন করে নিতে পারতেন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী তাঁর সময়ে তাঁর জীবিতকালে এক অতুলনীয় ও অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কেবল পাণ্ডিত্য থাকলেই সবকিছুর সমাধান হয় না। চরিত্রের কষ্টিপাথরে পাণ্ডিত্য যাচাই হয়। উপনিষদের ভাষায় "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, ন মেধয়া..." সফলতার জন্য 'শীল' আবশ্যিক। শাস্ত্রীজী বিরোধী মতাদর্শের সকলকেও আপন করে নিতেন তাঁর চরিত্র এবং ব্যবহারের কারণে।'

গত ২ মে বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় আয়োজিত পরোলোকগত পণ্ডিত বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী ব্যাখানমালায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন বিখ্যাত লেখক ও পণ্ডিত কৃষ্ণবিহারী মিশ্র। যদিও এদিন ব্যাখ্যানমালার বিষয় ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—মানবিক দিক্'। অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল মহাজাতি সদন (অ্যানেক্স) সভাগৃহে।

লীলাপ্রসঙ্গ বিষয় বলতে গিয়ে ডঃ কৃষ্ণবিহারী মিশ্র বলেন, পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী না হয়েও লোকশিক্ষা ও লোকসংস্কার-এর কাজ সাফল্যের সঙ্গে করে গেছেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তৎকালীন সমাজে স্বীকৃত বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ—বঙ্কিমচন্দ্র, কেশব সেন, মধুসূদন দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, (মাস্টার) মহেন্দ্রনাথ দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ তাঁকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করতেন। রামকৃষ্ণের কথা ছিল—সাকারই হোক বা নিরাকারই হোক, সঠিক পাকাপোক্ত বিশ্বাস থাকতে হবে। ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর উভয়েই মাতৃভক্ত ছিলেন। এখন নারীবাদ, নারী স্বাধীনতার কথা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু সে সময়ে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করে বিরাট কাজ করেছেন। আর মাতৃজাতিকে অবজ্ঞা করলে কী ফল হয় তা মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারতেই দেখিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুর আরাধ্যা ভবতারিণী, মা এবং স্বীয় স্ত্রী সারদাদেবীর মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখেননি। বিশ্বে এর অন্য তুলনা নেই। লোককথার মাধ্যমে লোকশিক্ষা দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। গিরীশ ঘোষ, নটী বিনোদিনীর মধ্যে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। গিরীশকে গেরুয়া কাপড় দিয়েছেন। কাজের লোকেদেরকে ডাকিয়ে একত্র সহভোজন করিয়েছেন। কালনার কট্টর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পদ্মলোচনকেও শূদ্রের সঙ্গে সহভোজন করিয়েছেন। লোককথার মাধ্যমে মানুষ তৈরি করেছেন। তৈরি করে গেছেন—একদল সন্ন্যাসী। তাঁর দুটি কথা—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা', এবং 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি', আপ্তবাক্যে পরিণত হয়েছে।

এদিনকার সভার সভাপতি ছিলেন ভারতীয় ভাষা পরিষদের নির্দেশক ডঃ বিজয় বাহাদুর সিং। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, আলোচনাসভা, শ্রদ্ধা, ভক্তি দিয়ে কিছু হয় না। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করতে হবে, গরীব-দুঃখীদের জন্য লেখাপড়া, অন্নের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি একটু ভিন্ন সুরে বলেন, শাস্ত্রীজীকে ব্যক্তিগত ভাবে শ্রদ্ধা করলেও তাঁর আদর্শের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা বা সহমত পোষণ করেন না। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে প্রবীণ সমাজসেবী যুগলকিশোর জৈথলিয়া সভাপতিসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ডঃ সিং জানেন না উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে কতজন সমাজসেবার জন্য, গরীব দুঃখীদের দুঃখ দূর করে চিকিৎসা, শিক্ষা, স্বাবলম্বনের জন্য কাজ করে চলেছেন। জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কাছে এসে এসব কথা জানতে হবে। সবাই-এর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভেদাভেদ রেখে দূর থেকে ভাসা ভাসা জানলে বা বললে হবে না। কাছে আসুন, দেখুন, বুঝুন, পরখ করুন।

এদিন স্বাগত ভাষণ দেন পুস্তকালয়ের সভাপতি ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠি। সভা পরিচালনা করেন শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস। শুরুতে সুললিত কণ্ঠে রামবন্দনা করেন শ্রীমতী শশী মোদী। প্রসঙ্গত, ২ মে শাস্ত্রীজীর জন্মদিন। তাঁর পরিবারের অনেকেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) বসে মহাবীর বাজাজ, প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী, বিজয়বাহাদুর সিং, কৃষ্ণবিহারী মিশ্র, যুগলকিশোর জৈথলিয়া এবং নন্দকিশোর লড্ডা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com